কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ

কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার,
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আগস্ট—১৯৬১

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দৃষ্টিকোণ

ভারতযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে, মানবভাগ্যের এক সঙ্কট সময়ে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ সূচনা হওয়ার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক যে দীর্ঘ প্রলম্বিত বক্তৃতা মহাভারতকার অবতারণা করলেন পৃথিবীর বহু ভাষায় তা নিয়ে গবেষণাধর্মী বহু দার্শনিক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গীতা কি শুধু দর্শন? তার সাহিত্য-মূল্য যদি কিছু না থাকে, তবে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হলো কেন? গীতা আগে সাহিত্য, পরে দর্শন। কিন্তু দর্শনের মেঘে ঢাকা পড়েছে গীতার সাহিত্যমূল্য। যুদ্ধের উত্তেজনামুহূর্তে গীতার উদ্ভব এবং আবির্ভাব মহাভারতের পাঠক-পাঠিকারা স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নেয়নি। এরকম অপ্রাসঙ্গিক, কাহিনী মহাভারতে একেবারে বেমানান। গীতা ধর্মগ্রন্থ বলেই ধর্মপ্রাণ মানুষ এই দুরূহ এবং দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বটি কুইনাইনের মতো কষ্টে গলাধঃকরণ করছে। পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্ত বলে ফরমান জারি করেছেন। গীতা একটা স্বতন্ত্র পুস্তক। তাকে জনপ্রিয় মহাকাব্যের অভ্যন্তরে সন্নিবেশ করে মহাভারতের সম্পাদকগুলো পাঠক-পাঠিকাদের মনের উপর ভারতীয় দর্শনের পাষাণভার চাপিয়ে দিয়ে ক্লান্ত করেছেন। গোটা মহাভারতে গীতা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেন।

এরকম এক ধারণা নিয়ে গীতাকে মৎ-লিখিত 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করিনি। আজ ধারণা বদলেছে। গীতা, মহাভারতে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। মহাভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন হয়েই মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তের পটভূমিকায় গীতাকে কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে বলেই আমরা তার ভেতর একটা বাস্তবতা দেখতে পাই। জীবনের বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্ত বিবেকের সঙ্গে, কর্তব্যের সঙ্গে, কর্মের, বিশ্বাসের, দ্বিধা হতাশা, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তার যে

নিরন্তর সংঘর্ষ তা থেকে উত্তরণের জন্যে কর্তব্য ও সংকল্প স্থির করা নিয়ে প্রত্যেক মানুষ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ছিন্নভিন্ন হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনও সেরকম একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুগছিল। সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করতে কৃষ্ণ তাকে যেসব উপদেশ দিয়েছিল তা মানব জীবনের সরোবর থেকে চয়ন করা এক একটি শতদল—অনিবার্যভাবে গীতায় বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছিল অনিবার্যভাবে। মহাভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা এক মানব মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ।

মহাভারতে গীতাকে অপ্রাসঙ্গিক এবং বেমানান মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। অর্জুনের মনোবল ফেরানোর জন্যে কৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় ধরে সাতশ শ্লোকে দার্শনিক নেতিবাচক বক্তৃতা দিয়েছে। এজন্যে গীতার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। গীতার প্রথম তিন অধ্যায়ের বক্তব্যই চতুর্থ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত দার্শনিক চাপান-উতোরের ভেতর দিয়ে কার্যত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সপ্ত শ্লোকে গীতা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের ধারণা হয়েছে কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত এবং সংযত উপদেশবাণীই সাতশ শ্লোকে পরিণত হয়েছে। এর ফলে গীতার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়।

গীতায় কৃষ্ণের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হল—বিশ্বস্রষ্টার মূলাধাররূপে তাঁকে দেখানোর জন্যই বারে বারে গীতাতে তা নানাভাবে, নানা শব্দে, নানাদিক থেকে বলা হয়েছে। এই পুনরুক্তিতে কলেবর বড় হয়েছে। ঈশ্বরত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যার বাষ্পচাপে যুদ্ধের সময়কালীন বাস্তবতা লঘু হয়ে পড়েছে।

তবে একথা মানতেই হবে, যে বা যিনি মহাভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে অন্বিত করে এই অংশের সংযোজন করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড় স্রষ্টা। তাঁর শিল্পবোধ, পরিমিতিবোধ, রসবোধ, সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ঘটনাবিন্যাস ক্ষমতা এবং লোকচরিত্রজ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর! কৃষ্ণযুদ্ধ সূচনার

পূর্ব মুহূর্ত ছাড়া অর্জুন ও কৃষ্ণের এ সংলাপ অন্য কোথাও সংস্থাপন করা যেত না। আমাদের ভুলতে দেয় না যে, যত বড় বীর ও সাহসী যোদ্ধাই হোক, কোথাও না কোথাও তার সূক্ষ্ম দুর্বলতা আছে। মানুষ নিজেও তার মনের সে গতিপথ চেনে না। চিনলে কোন সমস্যাই থাকত না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সেরকম এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংকটে অর্জুন দিশাহারা। মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলল। গীতার যুদ্ধ ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে নয়, মানুষের হৃদয়াঙ্গনে। আর এখানেই জমা হয়ে আছে গীতার সব গল্পরস। গীতায় অর্জুনের মনস্তত্ত্বের উপর কুরু-পাণ্ডবের বিরোধের আলো ফেলে গীতার পটভূমি ও তার উৎসকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। গীতা দর্শন শাস্ত্র নয়,—জীবন দর্শন। জীবনের কাব্য। এর ভেতর একটা তীব্র নাটকীয়তা আছে। চমক, উৎকণ্ঠার কোনো অভাব নেই। পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে তাব নিবিড় সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের গভীর গহনে উপন্যাসের প্রাণভোমরা আছে। তথাপি এ কথা ভীষণভাবে সত্য যে, গীতার জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক উপদেশ এবং দার্শনিক বাক্যালাপের ভেতর গল্পের ভাগ খুব কম। তবু যেটুকু আছে কম কী? এরকম একটা ধারণা নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হই। কাজটা খুবই দুরূহ এবং দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্কসূত্র রচনা করে, পরিবেশ গড়ে তুলে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে দ্বন্দ্বজটিল গল্পের সুগোল পরিণতিতে পৌঁছনো শ্রমসাধ্য হলেও চেষ্টা করতে ত্রুটি করিনি। তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত না করার উপর নজর রেখেছি। জীবনের রূপ, রঙ, রেখায় আঁকতে গিয়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গেছি। কারণ এই যুদ্ধ তো আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে তার প্রস্তুতি চলেছে। কতভাবে হয়েছে। সেই যুদ্ধ এখন ঘোষিত ও উপস্থিত। কিন্তু অর্জুনের নিরুৎসাহ এবং কৃষ্ণের বক্তৃতায় অসাড় হয়ে যাওয়া কৌতূহলকে উজ্জীবিত করতে—গীতার পটভূমির চৌহদ্দিতে গীতা যে মানব জীবনের কাব্য এই সত্যই অনুভূতিতে বাস্তব হয়ে উঠল। গীতার আকাশে দর্শনের মেঘ সরে যেতে জীবন সূর্যের আলো

উদ্ভাসিত হলো—কুরুক্ষেত্র নয়, মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র। সেখানে কতরকমের সব সংঘাত তার নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বার্থ, লোভ, আকাঙক্ষায়, আত্মম্ভরিতায় নোংরা হয়ে গেছে মানুষের সুন্দর জীবন। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করতে তাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন করতে দেশ ও জাতিকে কত মূল্য দিতে হয় এ তো তারই দর্শন। দর্শন এবং জীবন একাকার হয়ে গেছে গীতাকে।

দর্শনের বেড়া দেওয়া বাগানের ভেতর একটা গভীর ভাবে প্রবেশ করলে জীবনের রূপ, রঙ, ছবি চোখে পড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ দর্শনের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে গীতার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করে বলেই গীতা পাঠে ক্লান্ত বোধ করে। তার গভীর মর্মার্থকে অনুভব করতে পারে না। তাই সাধারণের কথা মনে রেখে গল্পে গল্পে গীতার অন্তর্নিহিত জীবন দর্শনের ধারায় গা ভাসিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছি। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করার মতোই কৃষ্ণ-অর্জুনের সংলাপ দিয়ে গীতা মর্মকে উপন্যাস রূপ দিয়েছি। বলা বাহুল্য, গীতাকে উপন্যাস করে তোলার চেষ্টা আগে এবং পরে কোনো ভাষাতেই হয়নি। গীতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় করে দেওয়ার পরিশ্রম সফল হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

পরিশেষে বলব, গীতাকে উপন্যাস করার জন্যে এর মূল্য, মর্যাদা এবং গৌরব একটুও কমেনি। বরং গীতাচর্চার এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। গীতা পাঠের পরিধিও তাতে কিছুটা বাড়ল।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি



কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন।

হেমন্তের ভোর আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছিল।

পশ্চিম আকাশের কোণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা তখনও মিলিয়ে যায়নি। পুব আকাশে কিছু একটা শীঘ্রি ঘটবে বলেই যেন সাতটি তারা বিদায় নিতে নিতে থমকে দাঁড়িয়েছে।

শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দ্বিধাভরা চোখে অর্জুন পুব আকাশের দিকে মুখ করে সূর্যোদয় দেখছিল।

রোজই দেখে। সূর্য উদয়ের মুহূর্তটা কোনোদিন এক হয় না। প্রতিদিনই নিত্য নতুন হয়ে ওঠে। অন্তত, অর্জুনের তাই মনে হয়। প্রতিদিন তার অনুভূতিও আলাদা। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে, প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ-লাবণ্য বহুবার দেখেছে। কিন্তু ভোরের সূর্যোদয়ের মতো সুন্দর নয়। নিশাবসানের মুহূর্তে নবীন জীবনের যে সূচনা তার মতো সম্মোহনকারক আর কিছু হয় না।

চতুর্দিকে একটা থমধরা ভাব ছিল। বাতাস ছিল না। শীত শীত ভাব কুয়াশামাখা অন্ধকারের সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল। জল স্থল, অন্তরীক্ষ থেকে অন্ধকার কে যেন অদৃশ্য হাতে মুছে দিচ্ছে। একটু একটু করে মলিনতা কাটছে। আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে

গাছপালা, সৈনিকদের ছাউনি, দিগন্তরের চারদিক। এ যেন এক স্বপ্নদৃশ্য।

মৃদু বাতাসের শিহরন খেলে গেল সারা শরীরে। বাতাসে মানুষের দীর্ঘশ্বাস তার ভেতরটা যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। অমনি বিসণ্ণতার ছায়াপাত ঘটল মুখে। আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস, মৃত্যু, কান্না, হাহাকারের কাল্পনিক ভাবনা তাকে ব্যাকুল করল। মনটা বড় অস্থির হলো। কী যেন করবে মনই তার জানে না।

সারা আকাশ রাঙিয়ে সূর্যোদয় হলো। উদয়ের মুহূর্তে একফালি কালো মেঘ হঠাৎ আড়াআড়িভাবে নবোদিত সূর্যকে দ্বিখণ্ডিত করল।

অর্জুনের সহসা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। হেমন্তের আকাশ ভরা রক্তের সমুদ্রে স্নান করে সূর্যদেব যেন রাঙা চেলি পরে উঠে এলেন। অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে সে গ্রহণ করছিল মিষ্টি রোদের সোনালি আলো। কিছুক্ষণের জন্যে তার আত্মসম্বিৎ ছিল না। এমন কি অহং পর্যন্ত।

ভোরের দ্বিখণ্ডিত সূর্য তার একাকিত্বের বোধটিকে আরো অসহনীয় করে তুলল। তথাপি, তার দুই চোখ দ্বিখণ্ডিত সূর্যের ওপর স্থির। একটা অশুভ বোধ তার মনে ছেয়ে রইল। বিরাট একটা ধ্বংসের আশঙ্কায় তার সমস্ত সত্তাটা ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। মনে হলো, সে নিজেই উদয়কালের সূর্যের মতো দ্বিখণ্ডিত। আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা হওয়ার পূর্বে তার যে জীবন ছিল তা প্রথম খণ্ড। কেমন করে হারানো অধিকার পুনরধিকার করা যায় তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেই কেটে গেল জীবনের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ডের জীবন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দিয়ে সূচনা হচ্ছে। কিন্তু এ হলো স্বার্থের যুদ্ধ। অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের সংঘর্ষ। তবু নিরীহ মানুষকেই তার জন্যে মূল্য দিতে হবে। তাদের কথা ভেবেই অর্জুনের চিত্ত আকুল হলো। যুদ্ধের দিন যত এগিয়ে

আসছিল মনটা ততই পাগল পাগল করছিল। সত্তার ভেতরটা নানাবিধ মিশ্র আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। বলতে কী, এই অনুভূতি অর্জুনের প্রথম। উদয়কালে সূর্য দ্বিখণ্ডিত হয়েই যেমন নতুন দিনের সূচনা করল তেমনি সেও সত্তার দ্বিতীয় জন্মের মধ্যে প্রবেশ করল।

সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। সেনা-ছাউনিগুলোতে কর্মব্যস্ততা পড়ে গেছে। মানুষের ভিড়ে থিক্ থিক্ করছে। ওদের দিকে তাকাতে অর্জুনের বুকের ভেতর প্রলয় ঘটে গেল। এই নির্বোধ মানুষগুলোর অপরাধ কী? তারা তো কোন দোষ করেনি। এদের নিজেরও কোনো সমস্যা নেই। বাইরের কোনো জটিল সমস্যায় এদের জীবনে জট পাকায়নি। তবু নিয়তি কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর জুড়ে মুখব্যাদান করে এদের সব অস্তিত্ব গ্রাস করতে উদ্যত। অথচ, তাদের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে বৃহৎ কোনো আদর্শের, লক্ষ্যের কিংবা সঙ্কল্পের সম্পর্ক নেই। ভালোবেসে, শ্রদ্ধায় কিংবা বৈরাগ্যে আত্মদান করছে তাও নয়। তবু তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিরোধের জন্যে তাদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। শিশিরভেজা ভোরের মতোই অর্জুনের মনটা সিক্ত হলো। কিছু বিষণ্ণও।

কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে উদয়কালের দ্বিখণ্ডিত সূর্য যে বার্তা বহন করে আনল তার মনে তা অনিত্য চিন্তা নয়। এক বৃহত্তর জীবনবোধ। তার সঙ্গে বৈরাগ্য বা ব্রহ্মানুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। এ হলো এক উপচানো করুণাঘন মানবিক সহানুভূতিবোধ। তার সঙ্গে অসহনীয় দুঃখবোধও মিশে আছে। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বিষাদজনিত কষ্ট ও বেদনাও ছিল। প্রভাতের রহস্যময় আলো আঁধারে উদয়কালীন সূর্যের উপর একখণ্ড কালো মেঘ তাকে দ্বিখণ্ডিত না করলে করুণাঘন মানবিক সহানুভূতির আলো পড়ত না তার অন্তঃকরণে। এখনো তার বুকে অনেক মমতা ভালোবাসা

জমা হয়ে আছে। একজন মানুষের অন্তরের এই আর্তিটুকু যদি না থাকল, তা-হলে সে কিসের মানুষ?

সিঁদুর-রাঙা সূর্য, পুব আকাশে রুপোর বড় একটা থালার মতো জ্বল জ্বল করছিল। তেজ ক্রমে প্রখর হলো। সূর্যের দিকে মুখ করে চেয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না। রোদের তাপে মুখ চোখ জ্বালা করছিল। অগ্রহায়ণের মিষ্টি রোদ্দুরে দেহটাও তেতে উঠেছিল। বিষণ্ণ মন নিয়ে সে তাঁবুতে প্রবেশ করল।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিয়েই চক্ষু তার স্থির হয়ে গেল। কৃষ্ণ তার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে। কী অনির্বচনীয় সেই মিষ্টি হাসি। অর্জুন চোখ ফেরাতে পারে না। ঐ মোহন হাসিতে সে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। কে জানে, কি ছিল সেই হাসিতে? কৃষ্ণের গলার স্বরেও এমন কিছু ছিল যা তার মনটাকে খুশিতে ভরে দিল। বলল : সখা, কদিন ধরেই তোমাকে ভীষণ অন্যমনস্ক এবং উদাসীন দেখছি। তুমি কিছু না বললেও তোমার মনের বিচলিত অবস্থা আমি অনুভব করতে পারি।

অর্জুন জবাব দিল না। চুপ করে থাকল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

রোদের তেজ বাড়ছে। ছাউনিতে ছাউনিতে মানুষের কলরব। সৈনিকের ব্যস্ততা, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীর বৃংহণ, অস্ত্রের ঝনঝন বিশাল প্রান্তর জুড়ে অহরহ হতে লাগল।

কৃষ্ণ গলার দরদ ঢেলে বলল : সখা, মানুষের যা কিছু সুন্দর, নরম অনুভূতি পাওয়া তা নিছকই একটা মনের ব্যাপার। বিন্দু বিন্দু আলোর মতো বুকের ভেতর স্পন্দিত হতে থাকে। হতে থাকবে যতক্ষণ মনের ঐ বিচলিত অবস্থা থাকবে। মানুষের স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, ভালোবাসার মতো দুর্বলতা এবং বড় শত্রু

এ সংসারে আর দুটি নেই। যে এর মায়া কাটাতে পারে না তার মতো ব্যক্তিকে রণাঙ্গনে মানায় না।

কৃষ্ণের কথায় আচমকা একটা অনুভূতি হলো অর্জুনের। বলল : মানুষের বড় রণাঙ্গন তার হৃদয়ক্ষেত্র। সেখানকার যুদ্ধ তো চোখে দেখা যায় না। মুখেও সব বলা হয় না। সে যুদ্ধ সব মানুষকে প্রতিনিয়ত করতে হয় তার নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে। মনের রণাঙ্গনের কাছে কুরুক্ষেত্রের এ যুদ্ধ কিছু নয়।

কৃষ্ণ একটু বিব্রত হয়। একটু অপ্রতিভ হয়ে হাসল। বলল : সখা, মনের ভেতর যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধ একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তা পার্থক্য হয়। মনের কতকগুলো দুর্বল ভাবাবেগের সঙ্গে মনের যে লড়াই হয় তাতে নিজের ক্ষত বিক্ষত করে শ্রান্ত হওয়া এক জিনিস, আর তার সঞ্জীবিত রূপ মন দিয়ে ছুঁতে পারা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। মন থাকলেই তার সঙ্কট থাকে। সঙ্কট ছাড়া মনের কোনো অস্তিত্ব আছে কি? তোমার মনে কোথায় সঙ্কট, তা তো আমি জানি। কিন্তু অবসাদে তোমার মন ছেয়ে আছে বলেই মনের গভীরে তোমার চাওয়াকে দেখতে পাচ্ছ না। সেই জন্যেই মন উতলা হয়েছে। এই দুঃখ তোমাকে শেখাচ্ছে কি করে সত্যকে জানতে হয়। জীবন বিরাট-অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সেখানে কত কি ঘটে প্রতিনিয়ত! সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব কালচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। সেই ঘূর্ণ্যমান চক্র আমাদের ভেতর সুখ-দুঃখ, বিষাদ-আনন্দকে পরিশ্রুত করে একভাবকে অন্যভাবে পরিণত করছে। ক্ষয় হচ্ছে প্রতিদিন আবার ক্ষতি পূরণও হচ্ছে। বড় আদর্শের আলো পড়ে জীবনটা উদ্ভাসিত হয় ; —দুঃখ, বিষাদ, অবসন্নতা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়। সবাকার সামনে বড় হবার মহতী ইচ্ছায়, ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে মহান সাহসে বড় হওয়ার মতো সুখ, আনন্দ আর কিছুই নেই।

অর্জুন কথা বলে না। চুপ করে চেয়ে থাকে কৃষ্ণের দিকে। তার মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে ঘেরা সুন্দর মুখের ওপর নরম মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। কী আরাত্রিক পবিত্রতা তার আলোয় ধোয়া সৌম্য মুখে। অর্জুনের গায়ে কাঁটা দিল। আর এক আশ্চর্য সুখে তার দেহ-মন ভরে যেতে লাগল। মনে হলো, শিশিরধোয়া রোদের আলো হয়ে আকাশ গঙ্গায় সে ভাসছে। এ এক অদ্ভুত উৎফুল্লভাব। মুখে কিছু বলতে পারল না অর্জুন, কিন্তু মনে মনে বলল : কৃষ্ণ আমাকে অবিশ্বাস করো না। তুমি ছাড়া কি আছে আমার?

কৃষ্ণ আড়চোখে অর্জুনকে পর্যবেক্ষণ করছিল। আর মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল : যুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি। তোমার অশান্ত চিত্তকে নিজে যদি শান্ত করতে শিক্ষা না কর, তবে আমার সাধ্য নেই বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারি। একান্ত মনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া সত্যি আর কিছু করার নেই আমার। শুধু বলা, বাইরের কোন অবস্থা যদি তোমার চিত্তকে উতলা করে, তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে তোমার মত বীরের লজ্জা পাওয়া উচিত। সখা, হতাশ হয়ো না; নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ। চারদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে স্তব্ধ কর, শক্তিকে সংহত কর তাহলেই তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকেও অতিক্রম করে যেতে পারে।

অর্জুনের দু'চোখের চাহনি কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর প্রেমে ও শ্রদ্ধায় নিবিড় হলো। বলল : সখা, আমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি জানি বিবেকের দহনে অন্তর যদি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তা হলে আমি চিত্তকে সংহত করব কেমন করে? অন্তরে তার আয়োজনকে সুসম্পন্ন করে তুলব কী করে? স্পর্শকাতর

সযত্ন গোপন দুর্বল স্থানটি বাইরের সংস্পর্শে পুনরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কৃষ্ণ, আমার মনকে তো আমি জানি। অন্যকে দুঃখ দিয়ে আঘাত করে আমি সুখী হতে পারব না।

কৃষ্ণ অর্জুনের কথা মন দিয়ে শুনল। নাভিমূল থেকে উঠে আসা একটা লম্বা শ্বাস পড়ল খুব ধীরে। বলল : তোমার দুর্বলতা কোথায় এবং কি জন্যে সে তো কতকটা আমি জানি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এবং বিশ্বের পরিস্থিতি যদি কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা কর তাহলে দেখবে আমরা কী গভীর সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছি। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হও। কল্পনার আকাশ থেকে দেশকালের মাটিতে নেমে এসে জগৎকে একবার দেখ। তাহলেই দুর্বলতা, অবসাদ, বিষণ্ণতা কর্পূরের মতো উবে যাবে। তুমি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

অর্জুন এই কথায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সুগন্ধী ধূপ আর ফুলের সুবাসে শিবিরের ভেতরটা ভরে ছিল। অর্জুন জোরে জোরে সুবাসিত বাতাসের শ্বাস নিল বুকভরে। তাতে স্নায়ুগুলো সজীব হলো কিন্তু মনের বিষণ্ণতা কাটল না। বিষাদে ক্লান্ত দু'-চোখের ভারীপাতা অতি কষ্টে তুলে ধরল অর্জুন। কৃষ্ণের দুটি চোখের উপর বিভোর দৃষ্টি মেলে হতাশ গলায় বলল : কে জানে? কী যে করব, আমি নিজেও জানি না।



মহাযুদ্ধের সব আয়োজন প্রস্তুতি সমাপ্ত। বিশাল প্রান্তরের পূবদিকে পাণ্ডবপক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী এবং পশ্চিমদিকে কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী-পরস্পরের শিবিরে অবস্থান করছে। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ রাজ্য কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের আত্মীয় এবং বান্ধব। সবাই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী-সহ এই যুদ্ধে শামিল হয়েছে। তবু অর্জুনের বিস্ময়ের অন্ত নেই। কৌরবপক্ষে ভারতের একশটি রাজ্য যোগ দিয়েছে। আর তাদের সপক্ষে আছে মাত্র এগারোটি রাজ্য। এছাড়া, রথী. মহারথী, অধিরথের সংখ্যাধিক্যও কৌরবপক্ষের তুলনায় নগণ্য। সৈন্যবল, লোকবল, অস্ত্রবলের ক্ষেত্রেও কৌরবপক্ষের সঙ্গে তাদের বিপুল অসামঞ্জস্য ও তার আর এক দুশ্চিন্তা। এই মহাযুদ্ধের সেনাপতি বলেই তাকে ভাবতে হয় বেশি। যুদ্ধে লোকবল, অস্ত্রবল একটা বড় সহায়। সেই বড় সহায়টির কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে ভীষণ অভাব। যুদ্ধ তো আর একজায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে না শত্রুপক্ষের দুর্বলতা বুঝে বিপক্ষদল মূল ঘাঁটিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই বহুদিক থেকে আক্রমণ করবে। তার জন্যে পাণ্ডবপক্ষকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে সম্ভাব্য আক্রমণ

কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে রথী মহারথী-সহ প্রচুর সংখ্যক সৈন্য এবং অস্ত্র মজুত রাখতে হবে। কিন্তু কৌরবপক্ষের তুলনায় তার সৈন্য, অস্ত্র, রথী, সৈনাপত্য দেবার মতো বিপুল সংখ্যক মানুষ কোথায়? যুদ্ধাঞ্চল বিস্তৃত হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা এক দারুণ সংকট। এই সংকটের মোকাবিলা কী করে যে অর্জুন করবে ভেবে পেল না। দিন যত এগিয়ে আসে অর্জুন ততই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে তাদের গৌরব বাঁচানো এবং হার ঠেকানো সত্যিই কঠিন হলো। কিন্তু অর্জুন নিরুপায়। তার কিছুই করার নেই। এই যুদ্ধ দ্রৌপদী এবং সহদেবের মতো সেও চেয়েছিল। কৌরবদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে তার সায় ছিল না। তবু যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুলের কথা ভেবে এবং কৃষ্ণের এবং শান্তি স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে ক্ষীণকণ্ঠে সন্ধির সমর্থন করেছিল। কিন্তু সে তার মনের কথা ছিল না। যুদ্ধ করে বিবাদের নিষ্পত্তি চেয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পরেই কোন রাজ্য কার পক্ষ সমর্থন করবে তার গোটা মানচিত্রটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল। কৃষ্ণের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে যাদবেরা দ্বিধাবিভক্ত। যে যাদব যুক্তরাজ্যের অখণ্ড শক্তি-সামর্থ্য ছিল কৃষ্ণের বড় বল ও ভরসা, তাদের একটা বড় অংশ কৃষ্ণের কর্তৃত্বের বাইরে চলে গেল। যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পাণ্ডবপক্ষ থেকে তারা সব সমর্থন প্রত্যাহার করে কৌরবপক্ষে যোগ দিল। কৃষ্ণের অতবড় যে নারায়ণী সেনা; তারাও কৃষ্ণের নির্দেশ মেনে পাণ্ডবপক্ষে দাঁড়াল না। অনুগত অগ্রজও পাণ্ডব-কৌরবদের ঘরোয়া যুদ্ধে যাদবদের জড়ানোর প্রতিবাদে এক চরম সংকটমুহূর্তে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে দেশত্যাগী হলো। কৃষ্ণের নেতৃত্বকে ভারত নরপতিরা ভালো মনে গ্রহণ করেনি। তার রাজনৈতিক উত্থানের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ানোর জন্যই কৌরবপক্ষ শক্তিশালী হয়েছে।

শক্তির এই অসামঞ্জস্যের জন্য কৃষ্ণ একটুও উদ্বিগ্ন নয়। তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। বুকে বল, মনে সাহস তার অটুট। বিশ্বাসে তার একটুও ভাঙন ধরেনি। এই ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবেরা যে জয়ী হবে তাতে কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কৃষ্ণের এই বিশ্বাসই তাদের পাথেয়। তাদের সব বল ও ভরসার উৎস। তাই এক চরম সংকটের ভেতর, উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার ভেতর কৃষ্ণ এক আলোর দিশারী হয়ে উজ্জ্বলতর আলোর দিকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। কী দারুণ তার আত্মপ্রত্যয়। তাকে বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায়। সে শুধু আহ্বান করে, আকর্ষণ করে। করবে না কেন? কথায়, কাজে আচরণে, ব্যক্তিত্বে, মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠত্বে, বীরত্বে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায়, ক্ষমায় তার মতো মানুষ কম জন্মে বলেই রাজসূয় যজ্ঞে পিতামহ ভীষ্ম নিজে কৃষ্ণবিরোধী হয়েও কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য দিতে দ্বিধা করেননি। একজন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের সময় তার অনেক গুণ, কর্ম, জ্ঞান, ক্ষমতা, আদর্শ, শ্রেষ্ঠত্ব, মহানুভবতা, ধর্মপ্রাণতা, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞাকে বিচার করতে হয়। কৃষ্ণের মধ্যে একাধিক পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সমাবেশ তাকে এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ করেছে। মুখভরা হাসি সব সময় তার। সে কারো অনুকম্পা চায় না, সমবেদনাও চায় না কারো কাছে। কৃষ্ণের অননুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্য সকলে ঈর্ষা করে তাকে। শুধু এই কারণে তার শত্রুসংখ্যাও অধিক। যারা পৃথিবীর ভালো চায়, মানুষের ভালো করে, দশের প্রিয় হয়,—তাদের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে শত্রুরা তাকে ছোট করতে চায়। কিন্তু যার হৃদয় বড়-ছোট করার চেষ্টা করলে কি সে ছোট হয়? ঈর্ষা আর প্রেমে যে অনেক ব্যবধান। সে ব্যবধান অতিক্রম করে ঈর্ষাপরায়ণের দল কোনোদিন কৃষ্ণের গৌরব, মহিমা ছুঁতে পারবে না। মূর্খেরা

বুঝবে কি করে কৃষ্ণ কত শক্তিমান? লৌহ কারাগার যাকে আটকে রাখতে পারল না ; মধ্যরাতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও যার পথরোধ করতে পারল না—তার অনন্ত যাত্রাপথে বাধা দেবে কে? জরাসন্ধের বিশাল বাহিনীও পারেনি মথুরায় তাকে অন্তরীণ রাখতে ; দস্যু কালযবনের বীর্যের আস্ফালনও ব্যর্থ করে দিয়েছে কিশোর কৃষ্ণ। তার কোন কাজটা না বিস্ময়ের?

অর্জুনের দুর্বল মনটা কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে এক নতুন শক্তি দেয় তাকে। যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে জয়। অতীত ইতিহাস তো তাই বলে। কংসের মতো অত্যাচারী স্বৈরাচারী শাসকের সঙ্গে কৃষ্ণ কী অসহায় অবস্থার ভেতর একা যুদ্ধ করেছে। জরাসন্ধের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উন্মূল করতে এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি কোথাও? কালযবনের মতো দস্যুকে কৃষ্ণ নিজে হত্যা করেনি। নিজের ভ্রমেই নিহত হয়েছে সে। বৃহৎ বৃহৎ শক্তির পতন ঘটল অথচ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার গায়ে তার আঁচ পর্যন্ত লাগেনি। নিজের বুক পেতে সব ধাক্কা সহ্য করেছে। সারাজীবন ধরে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেছে। কত অসম্ভবকে সহজে সম্পন্ন করেছে। কৃষ্ণের সব কাজই আশ্চর্যের। জন্মেই সে কারারুদ্ধ ; কিন্তু কারাগার তাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি। রাজা না হয়েও সে মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার ভেতর বড় হয়ে মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়ে রইল। এ কি কম কথা! ঈশ্বরের শক্তি কী, মানুষ চোখে দেখেনি। কিন্তু তার সমস্ত কার্যকলাপের ভেতর এক ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটতে দেখেছে অর্জুন। কৃষ্ণ তার চোখে মানুষ নয় ঈশ্বরের প্রতিভূ। যা কিছু অসম্ভব, যা কিছু ভালো এবং শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না তাকেই আমরা ঐশী শক্তি বলি। কৃষ্ণ সে ঐশী গুণসম্পন্ন মানুষ। জয়লক্ষ্মী সর্বদা তার সঙ্গেই আছে।

পরাভব কাকে বলে কৃষ্ণ জানে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও জয়লক্ষ্মী কৃষ্ণের সঙ্গে থাকবে। তাকে ত্যাগ করার কোনো ঘটনাই হয়নি। এ যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। এক চিরবঞ্চিত অধিকারহারা মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম।

সংগ্রামের নামে অর্জুনের বীর হৃদয় নেচে উঠল। দীর্ঘ পরিশ্রমের অবসাদজনিত ক্লান্তি, দুর্বলতায়, তার মনে যে দুর্ভাবনা বাসা বেঁধেছিল, যে সংশয়, ভীরুতা তার ভেতর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই ধূপের সুগন্ধের মতো অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছ্বাস, তাকে যেন নবীকৃত করল। সে বীর, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, সৈনিক—যুদ্ধই তার ধ্যান-জ্ঞান। যুদ্ধ করা ছাড়া তার অন্য কি করার আছে? যুদ্ধে বিরত হওয়ার অর্থ স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া। ধর্মত্যাগ করলে একজন মানুষের বেঁচে থাকার আর কোনো মানে থাকে না। অর্জুনের উদ্দীপিত মনে কিসের আলো এসে পড়ল!

অর্জুন যুদ্ধযাত্রার জন্যে নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করল। যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে রথ প্রস্তুত করতে বললো। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সরেজমিনে গোটা রণস্থল পরিদর্শন করে বুঝে নিতে চায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা কতখানি লাভবান হবে। সমরশক্তিতে কৌরবদের সমকক্ষ তারা নয়—এ অবস্থায় যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্যি কি সম্ভব? সমরশক্তি, লোকসংখ্যা, অশ্ব, হস্তী, রথের সংখ্যা সব নয়। উন্নতমানের সমরাস্ত্র যার হাতে বেশি কার্যত জয় তারই। সে বিচারেও কৌরবদের সমকক্ষ তারা নয়। এ অবস্থায় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। প্রত্যেক মানুষ একটা আশা নিয়ে এগোয়। কিন্তু কোন আশা নিয়ে সে কার পেছনে ছুটে চলেছে? এতো অন্ধকারে দৌড়নো। অন্ধকারকে ভাঙবার প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনের সব দ্বিধা সংশয়ের উৎস তো এখানেই। শুধু শুধু পরাজিত হওয়ার জন্য, হার স্বীকারের জন্য যুদ্ধ করার কোনো

মানে হয় না। জয়হীন যুদ্ধের গৌরব কি? মিছে মিছে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনহানি করে কী লাভ? যে যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত—যেখান থেকে প্রত্যাশা করে কিছু পাওয়ার আশা নেই, সেখানে অনর্থক কিছু পাওয়ার লোভ করতে অর্জুনের আপত্তি। জীবনের কোনো যুদ্ধেই সে ভয় পায়নি। যে কোনো লড়াইতে প্রতিপক্ষের সমতলে অথবা উচ্চতায় যোদ্ধাকে নেমে অথবা উঠে আসতেই হয়। উঠতে আপত্তি ছিল না। কোনোই। কিন্তু চিরদিনই নামতে বড়ই আপত্তি তার। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা সমানে সমানে নয়। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপবর্মার মতো রথী, মহারথী, সমরকুশলী বীর যোদ্ধাও তাদের নেই। এই বাস্তব সত্যটা মেনে নিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু এত বড় দুর্বলতা সম্পর্কে সে ছাড়া আর কেউ সচেতন নয়। গভীর করে বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা পর্যন্ত কারো নেই। এমন কি কৃষ্ণেরও না। অথচ যুদ্ধ পরিচালনার সব দায়িত্বটা তার। যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি। দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনী একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশের অপেক্ষায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুনের বারংবার মনে হতে লাগল যুদ্ধে হেরে গিয়ে শহিদ হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করার আগেই তার উপর ইতি টেনে দেওয়া অনেক ভালো। ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা করে, বৃহত্তর মানব কল্যাণের স্বার্থে নিজেদের দাবি অগ্রাহ্য করে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি বিনা যুদ্ধে কৌরবদের জয়ের গৌরব অর্জন করতে দেওয়া হয় তা-হলে নৈতিক জয় হবে তাদের। হার স্বীকারের মূল্য যুদ্ধ জয়ের চেয়েও বেশি। মূল্যবোধহীন, লোভী এক শ্রেণীর স্বার্থ ও চক্রান্ত থেকে সমাজ, সংসার ও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার মূল্য যে কত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন সেই প্রশ্ন নিজেকে করল।



বহুদূর হতে পিতামহ ভীষ্মের মহাশঙ্খনাদ বাতাসে রণিত হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। যুদ্ধভেরী বাজল। অগণ্য শঙ্খ, শিঙা, দুন্দুভি বাজল। তুমুল শব্দে বাদ্যধ্বনি হতে লাগল।

অর্জুনের ভেতরটা বেশ একটু অস্থির হলো। ধীরে ধীরে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কপিধ্বজ রথে উঠল। সারথির আসনে পার্থসখা কৃষ্ণ। অধরে তার স্ফুরিত কৌতুক হাসি। একহাতে সপ্তাশ্বযুদ্ধ কপিধ্বজ রথের অশ্বরজ্জু, অন্য হাতে কৃষ্ণের মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য। অর্জুন রথে আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে কৃষ্ণ অভিনন্দিত করল অর্জুনকে। যাত্রা ঘোষণার বার্তা তার, বাতাসে শিহরন তুলে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র জুড়ে অনুরণিত হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। নিথর স্তব্ধতার ভেতর অর্জুন সহসা কেঁপে উঠল। মহাকালের ডমরু হয়ে বাজতে লাগল কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য। সপ্ত অশ্বের ক্ষুরে নটরাজের নূপুর বাজছে তা তা থৈ থৈ করে। নটরাজ নাচছেন। তাঁর এক পা অতীতে. এক পা বর্তমানে। আর কৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি প্রলয় হাসির অট্টরোল হয়ে বাজতে লাগল তার সমস্ত স্নায়ুর ভেতর। বুকের হাড় গুঁড়িয়ে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়। ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে

বলে, সখা তোমার রথ থামাও, শঙ্খ বন্ধ কর। আমি সহ্য করতে পারছি না। সকল কলুষ তামসহর সদয়হৃদয় শিব হয়ে যাও। নীলকণ্ঠ হয়ে সব বিষ তুমি শুষে নাও। আমাকে মুক্তি দাও। আমি যুদ্ধে যেতে চাই না। আমি আপনজনদের মধ্যে অক্ষত শরীরে বাঁচতে চাই।

রণসাজে সজ্জিত অর্জুন অপরূপ দৃপ্তভঙ্গিতে রথোপরি দাঁড়িয়ে। হাতে গাণ্ডীব, পৃষ্ঠে তূণ ভর্তি শর। নয়নে সুদূরপ্রসারী অতলস্পর্শী দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টিতে স্বপ্ন-কল্পনা, আনন্দ-বিপদ, হাসি-কান্নায় কী মায়াবী!

কৃষ্ণও অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে। এক পা রথ মধ্যে, আর এক পা তার সারথির আসনে। মুখে তার চটুল হাসি। চোখে কৌতুক। নয়নে অতলস্পর্শী প্রশান্ত দৃষ্টি। শ্যাম অঙ্গে পীত উত্তরীয় ; সেই উত্তরীয়ের ফাঁকে ফাঁকে নানাবিধ রত্নের কারুকাজ। সূর্যের আলো পড়ে ঝলকে উঠল তার অপরূপ লাবণ্য। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বীর্য ও শান্তির ঘনীভূত মানব বিগ্রহ যেন।

কৃষ্ণের অনুপম রূপ, লাবণ্য, তার দীপ্ত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতায় ভরে উঠল অর্জুনের চিত্ত। সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের দেশ থেকে আরো এক অনন্ত সম্ভাবনাময় সব পেয়েছি দেশের দিকে কৃষ্ণের রথ ছুটে চলেছে। সে তার আরোহী শুধু। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়—দীর্ঘ ক্লেশ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে এক নতুন জীবনের অভ্যুদয় ঘটাতে হঠাৎ তার বীর হৃদয় নেচে উঠল। শরীরের রক্ত চনমন করছে। অনুভূতির মধ্যে ঘুঙুর বাজছে। দু'ধারে প্রত্যাশা যেন প্রজাপতির পাখা মেলে দিয়েছে। অর্জুন নিজেও কম অবাক হলো না! তার কোন অনুভূতিটা হর্ষ, আর কোনটা বিষাদ—সে নিজেই বুঝতে পারল না।

ধুলোর ঝড় তুলে রথ ছুটল।

অর্জুনের শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বাজছে যেন। সত্যি কি তাই? আসলে, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাই তাকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তুলেছিল। তাই তীব্র উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠা নিয়েই বলল : সখা, এখনো যুদ্ধ বাধেনি। যুদ্ধের আগে আমি একবার নিজের আত্মাকে দেখব। তুমি উভয়পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর। কয়েকদিন ধরে আমার মনে যে-প্রশ্ন ঝড় তুলেছে, যার উত্তর আজও পাইনি—রণস্থলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি সেই সত্যের মুখোমুখি হতে চাই। কোন সত্য—আমার দেহ মন জুড়ে সুরের তরঙ্গ তুলেছে? কী চায় সে? এরপরেই অহং বোধে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে বলল : দুর্যোধনের হিত কামনায় যাঁরা তার পক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি তাঁদের একবার দেখব। দুরাত্মারা দেখুক কৃষ্ণসখা, গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় একটুও দুর্বল হয়নি। অসহায়ও ভাবছে না নিজেকে। এ রণভূমিকে তাদের বধ্যভূমি করব আমি। এ আমার শপথ।

কৃষ্ণের খুব অবাক লাগল—অর্জুনের কণ্ঠস্বর ভাঙা এবং কাঁপা। শপথে প্রত্যয়ের অভাব কৃষ্ণের কানে বাজল। নির্বাক দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণের দুটি উজ্জ্বল চোখ অর্জুনকে নয়, তার আত্মাকে দেখছিল। অর্জুনের মনের গভীরে খুব গভীরে যে আত্মার বাস সেখানে এখন কোন অবস্থা চলেছে কৃষ্ণ ভালো করেই জানে। মনের এ অবস্থার নাম কি — হর্ষের, বিষাদের, ভয়ের, আশঙ্কার, না সব মিলে একটা বিরাট কোন জিজ্ঞাসার? মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ ভালো করে জানে মানুষ যেহেতু তার মনের কারণেই মানুষ তাই প্রত্যেক মানুষই মনের কষ্টে ভুগবে। অর্জুনের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শক্ত মনের মানুষেরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকবেই। যা তাকে মানুষ হিসেবে হাস্যাস্পদ, ভীরু, কাপুরুষ করলেও মানুষ হিসেবেই একদিন এই অপূর্ণতাই তাকে পূর্ণতা দেবে। কিন্তু এখন ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে

তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

কৃষ্ণ উভয়পক্ষের অগণিত সৈন্যের মধ্যে কপিধ্বজ চিহ্নিত রথ স্থাপন করল। মনে হলো জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে সূর্যোদয় হলো। সাতটি অশ্বের লাগাম কৃষ্ণ দু'হাতে টেনে ধরেছিল। কিন্তু অশ্বগুলি বশ মানছিল না। তাদের গতি রুদ্ধ করতে কৃষ্ণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কোমল পেলব হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল। অশ্বগুলি হস্তধৃত বল্গার মধ্যে ছটফটিয়ে উঠল। তাদের অস্থিরতা দমন করতে এবং শাসনে আনতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। রথ নিশ্চল হলে কৃষ্ণ ফিরে তাকাল সখা অর্জুনের দিকে।

অর্জুন নির্বাক। নিথর পাথরের মতো স্তব্ধ। শান্ত, মৌন। মনে হচ্ছিল তার ভেতরে প্রাণ নেই। সাধকের তন্ময়তা তার দুই চোখে। সে দৃষ্টি পিতামহ ভীষ্মের উপর স্থির। কখনো বা উপচে গেল আচার্য দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবার উপর। অর্জুনের মনের মধ্যে ঝড় উঠল। সে ঝড় তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। তার শরীর মন বারংবার চমকে উঠছিল। কী আশ্চর্য! সময়ের সমুদ্রে পেরিয়ে এই রণক্ষেত্র ছেড়ে কোন সুদূর অতীতকে সে দেখছে? বারে বারে কখনো দিনে কখনো রাতে সে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল হস্তিনাপুরের প্রাসাদে। যেখানে তার কৈশোর যৌবন কেটেছিল। বুকের ভিতর দপ্ করে স্মৃতির দ্বীপ জ্বলে উঠল।



অর্জুন স্পষ্ট পিতামহের গল্প শুনতে পাচ্ছিল। পিতামহ তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন—সেও হাসছে তাঁর সঙ্গে। হাতছানি দিয়ে তেরো বছরের অর্জুনকে ডাকতে দেখতে পাচ্ছে। দু'চোখে তাঁর কৌতুক, অধরে টেপা হাসি। মৃদু স্বরে আহ্বান করছেন— এসো। আমি তোমার দাদু। আমার সঙ্গে গল্প করবে না? আমি খুব ভালো গল্প বলতে পারি।

পিতামহের আহ্বানে বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে। কি আশ্চর্য! কতকাল আগের কথা। তখন সবে হস্তিনাপুরে এসেছে। তার বয়স তখন তেরো, ভীমের চোদ্দ আর যুধিষ্ঠিরের ষোলো। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পিতৃহীন হয়ে পিতৃরাজ্যে এলো। সেখানে তখন তারা আশ্রিত। ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব, তারা বন্ধু, খেলার সঙ্গীও বটে। তবু তাদের মর্যাদা ধার্তরাষ্ট্রদের সমান নয়। আশ্রিতদের যেমন কপাল; দাক্ষিণ্য পেলেও মর্যাদা পায় না। তাদেরও সেই অবস্থা। পিতামহ খুব কাছ থেকেই তাদের মনের ব্যথাটা বুঝতেন। তাই, তার স্নেহ-ভালোবাসা, মমতাটা তাদের ওপরেই বেশি ছিল। আর হৃদয়ের টানটা ছিল তার উপরেই। তাই কথায় কথায় আদরে সোহাগে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কী অনির্বচনীয় সেই শারীরিক অনুভূতি। অতীতের কথায় তার সারা গা শির শির করে উঠল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। তার সমস্ত ধারণা এবং বিশ্বাস

গোলমাল করে দিল।

সাদা কালো চৌকো চৌকো পাথরে বাঁধানো মসৃণ মেঝের উপর রক্ষিত আরাম কেদারায় পিতামহ দেহটা এলিয়ে দিয়ে ঘাড় উঁচু করে তার দিকে চেয়ে আছেন। আর সে কেদারার হাতলের উপর বসে আছে। পিতামহ তার সঙ্গে কিছু একটা কথা বলছিলেন। সে তার পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছিল। তারপর ফিস ফিস করে কানের কাছে মুখ রেখে বললেন : চারদিকে ধার্তরাষ্ট্ররা ঘুরছে, তোমাকে-আমাকে এভাবে দেখলে কী বলবে বলতো?

তাঁর কৌতুকের জবাবে বলল : বলবে, পিতামহ তুমি খুব খারাপ। অর্জুনকে শুধু ভালবাসো। আমরা তোমার কেউ না। —ওদের রাগতে দেখলে হিংসা করতে দেখলে আমার খুব মজা হয়। গোমড়া মুখ দেখলে হাসি পায়। ভালো লাগে।

পিতামহকে তার কাঁধ থেকে হাতটা স্পষ্ট সরিয়ে নিতে দেখল। থমথমে বিষণ্ণ গলায় বললেন : তোমাদের কেউ মুখ ভার করে থাকলে আমার খুব কষ্ট হয়। তোমরা সকলে আমার চোখে সমান।

অর্জুনের চেতনা জুড়ে চলেছে অতীতের এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব। সেখানে তার কোন অভাব নেই, দৈন্য নেই। অনেক সময় পেরিয়ে এসেও তার জ্যোতি একটু কমেনি। পিতামহের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো! অবকাশের বেশি সময়টা তার সঙ্গে গল্প করে, খেলা করেই কাটাতেন। সব ব্যাপারে তাকে সঙ্গ দিতেন। কতদিন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছেন। রাত্রি হলে পূর্বপুরুষদের কীর্তির গল্প বলতেন। আর বিনিময়ে সে গান শোনাত তাঁকে। সেই দিনগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, কিন্তু তার স্মৃতি মন থেকে আজো মুছে যায়নি। অতীতে যা কিছু ঘটেছিল তা তো শুধু স্মৃতি নয়, মনে পড়া নয়, তার থেকে আরো কিছু—তা বাস্তব অনুভূতি। শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনুরাগের সে সম্পর্ক ভুলে গিয়ে কোন্ প্রাণে তাঁকে লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করবে? খোলা মাঠে সবাকার সামনে অস্ত্র হাতে কী করে মুখোমুখি লড়বে? কথাটা ভাবতেই অর্জুনের চোখ ছলছল করে উঠল। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল।



কৃষ্ণ তো অবাক! এ কোন অর্জুনকে দেখছে? একটু আগে গর্বিতভাবে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে যে রথ নিয়ে যেতে বলল, বিষাদে এমন ম্রিয়মান কেন সে? তার মুখে সেই ঔজ্জ্বল্য কোথায়? কী হলো অর্জুনের? এমন কি হলো যে হতাশায় ভেঙে পড়ল? নিজের মনের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে সে যে ছিন্নভিন্ন ; তার চোখমুখের ক্লান্তি দেখেই গভীর করে টের পেল কৃষ্ণ। কিন্তু নিজেকে তার এত ব্যর্থ ভাবার কারণ কি। গালে হাত রেখে অর্জুন মন খারাপ করে দেয়া বিষণ্ণ আপসোস আর হতাশা নিয়ে রথে বসে কেন? গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কৃষ্ণ চেয়ে রইল তার দিকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর বলল : পার্থ, যুদ্ধে তো তুমি ভয় পাও না। গাণ্ডীবকে এমন অনাদর করে সরিয়ে রাখনি কোনদিন। যে অর্জুন অস্ত্র ছাড়া কথা বলে না, সে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, একথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। এমন দিশেহারা হতেও তোমাকে আগে দেখিনি। তোমার আকস্মিক ভাবান্তর আসলে যে কী, তা তুমিই জান।

অর্জুনের চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। কৃষ্ণের

প্রশ্নে চমকেও উঠেছিল যেন একটু। যে ভয়টা চোখ তুলে তাকানোর সময় তার মুখে মাখামাখা হয়েছিল। বুক থেকে সহসা উঠে আসা একটা আর্তিতে ডুবে গেল তার কণ্ঠস্বর। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : সখা, এ আমি কোথায় এলাম? এদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে? এঁদের অনেকে আমার পরম আত্মীয়, বান্ধব, ভ্রাতা, প্রিয় পরিজন, গুরু, আচার্য এঁদের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করা যায়? শত্রুর আসনে বসিয়ে কেমন করে ওঁদের উপর অস্ত্রাঘাত করব? কোন বিবেচনায় পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ, আচার্য দ্রোণ, কৃপের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করব? এঁরা কেউ কোনোদিন. আমার শত্রু ছিলেন না, আজও নেই। কোন প্রাণে আমি তাঁদের হত্যা করব? এতবড় অধর্ম আমি করতে পারব না। সখা, আমাকে তুমি পাষণ্ড, নিষ্ঠুর হতে বল না। আমি পারব না। সব দেখে শুনে, যুদ্ধে আমার আর উৎসাহ নেই। আমি যুদ্ধ করব না। শিবিরে ফিরব।

কৃষ্ণের দুই চোখে তিরস্কার এবং ভর্ৎসনার আগুন গন গন করতে লাগল। অর্জুন সেই তীব্র তেজের দিকে চোখ তুলে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। বড় অসহায় লাগছিল।

একটা সময় বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসে যখন মূল প্রশ্নের জবাব তাকে একা দিতে হয় নিজের বিবেকের কাছে। তখন এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় ছেয়ে থাকে তার সমস্ত সত্তা। এ রকম একটা অশেষ ক্ষমা-মাখানো অনুভূতি হলো অর্জুনের। হঠাৎই কৃষ্ণের কাছে নতজানু হয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে করজোড় করে আকুল কণ্ঠে বলল : সখা রক্ষা কর। ভুল করেছি। এইসব অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের রুধিরসিক্ত রাজ্য আমি চাই না। তুচ্ছ হোক পৃথিবীর রাজ্য। স্বজন হারানোর বেদনায় সরোবরে প্রেমের কোন শতদল আমি ফোটাব? স্বজন বধ আমার দ্বারা হবে না। এরকম রাজ্যের চেয়ে ভিক্ষে করে দিন যাপন করব, তবু যুদ্ধ করব না। আমি অস্ত্রত্যাগ করছি।

অর্জুনের দুই চোখে জল। পদ্মপত্রের শিশিরবিন্দুর মতো টল টল করছিল। তার কম্পিত আঁখি-পল্লব মথিত হচ্ছিল কষ্টে, বেদনায়। তার আর্ত প্রার্থনায় পৌরুষের অপমান লুকোনো ছিল না। ছিল নিয়ন্ত্রণ। সর্বনাশ রোধের শাসন। কিছুটা শুভবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা।

অর্জুনের দুর্বলতায় কৃষ্ণ আশ্চর্য হলো। তার স্পর্শকাতর মনটা বিবেকের দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। কিন্তু অর্জুনের এই কষ্টের কোনো দাম নেই। এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত ভীতু, দুর্বল, নরম প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হলো কৃষ্ণের। অল্পেই কাতর হয়ে পড়ল সে। অর্জুনের অবস্থা দেখে কৃষ্ণের ভেতরটা যে ভীষণ অস্থির এবং বিচলিত হয়েছিল, বাইরে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায়, চিন্তায়, তার ললাটদেশ কুঞ্চিত হলো। আশঙ্কায়, দুর্ভাবনায় ভুরু কুঁচকে গেল। অবশেষে, অর্জুনই কি ব্যর্থ করে দেবে তার সব স্বপ্ন আশা, কল্পনা? স্বর্গ কি হবে না কেনা? দুরাত্মা, দুষ্কৃতকারীদের কবলমুক্ত হবে না ভারতভূমি? ন্যায়ধর্মের হবে না প্রতিষ্ঠা? দুরারোহ দীর্ঘ গিরিপথ অতিক্রম করে অবশেষে গোষ্পদ পারাপারে ব্যর্থ হবে সে? সম্মুখে সাফল্যের স্বর্ণচূড়া! আর অল্পমাত্র বাকি! কিন্তু অর্জুনের একি ভাবান্তর?

ক্ষুব্ধ রুষ্ট বিচলিত কৃষ্ণ শক্ত হাতে অশ্বরজ্জু টেনে ধরতে রথ দুলে উঠল। বসুন্ধরা টলে উঠল। তবু অর্জুনের ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে বলল, সখা তুমি কি পাগল হলে? তোমার মতো বীরের এই কাপুরুষতা মানায়?

কৃষ্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে অর্জুন কী বলবে? পিতামহ ভীষ্ম বৃদ্ধ হলেও তাঁর সমকক্ষ ধনুর্ধর, সর্ব অস্ত্রে পারঙ্গম বীর ভূ-ভারতে একজনও নেই। অর্জুনও নয়। কৃষ্ণকে তো আর পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না — পিতামহ ও তার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ যুদ্ধে কৃষ্ণ নিজে কোনো অস্ত্র ধরবে না। কোন যুদ্ধও করবে না। কারণ এ যুদ্ধের দু'পক্ষই তার সমান আত্মীয়। তার চেয়েও

বড় কথা হলো তাকে নিয়ে এক বিতর্ক জমে উঠেছে। পাছে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে তাই কৌরব-পাণ্ডব কারো পক্ষেই যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না সে।

বড় জোর রথের সারথি হয়ে কাজ করতে পারে। দর্শকের মতো রণক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ দেখবে। সুতরাং এ অবস্থায় কার ভরসা করে ; পিতামহের মতো অপরাজিত মহাবীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? কোন সাহসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবে? নিশ্চিত হারবে জেনেও যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ করার মতো নির্বুদ্ধিতা করে কেউ? নিজের অপরাজিত বীর মহিমার গায়ে শুধু শুধু কলঙ্কলেপন করে কী লাভ?

আচার্য দ্রোণ কৃপ'র সমতুল যোদ্ধার একজনের মুখও তাদের পক্ষের কোনো বীর ও রাজন্যবর্গের ভেতরে দেখতে পেল না। এঁরা দু'জনেই তার অস্ত্রগুরু। তার কৃত্বিত্বে তাঁরা গর্বিত। তার সাফল্যকে তাঁরা নিজদের সাফল্য মনে করেন। এমন কি পুত্র অশ্বত্থামার অধিক স্নেহ করেন তাকে। স্নেহের অগ্নিপরীক্ষায় একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করে তাকে সন্তুষ্ট করেছে। আচার্য তার চেয়ে বড় কাউকে হতে দেননি ; পাছে তার কৃতিত্ব বিপন্ন হয়, সেজন্যে কর্ণের আচার্য পদও গ্রহণে রাজি হননি। শুধু তার কথা ভেবে, তার সন্তোষের জন্য যে গুরু অন্য শিষ্যের উপর এত বড় অবিচার, অধর্ম অন্যায় করতে পারেন — তাঁর প্রতি তো শিষ্য হিসেবে তারও কিছু কর্তব্য থাকে। কৃতজ্ঞতা দেখানো তারও ধর্ম।

সকালের শুভ্রোজ্জ্বল রোদের পুণ্য আলো দ্রোণের মুখের উপর পড়েছে। কী অপরূপ দেখাচ্ছে তাঁকে। ঐ শান্ত, সৌম্য মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ পারে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে? তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করার ধৃষ্টতা তার নেই। আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধের কতখানি যোগ্য, সে প্রশ্নও মনে উদয় হলো। একজন

মানুষ সারা জীবন শিক্ষার্থী হয়েও শ্রেষ্ঠ গুরুর সব বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে না। দেবপুত্র কচও পারেনি সর্ববিদ্যা আত্মসাৎ করতে। এমন কিছু সম্পদ প্রত্যেক মানুষের ভেতর থাকে যা অননুকরণীয়। নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সব মানুষ আলাদা আলাদা মেরুতে অবস্থান করে। দুই মেরু যেমন সর্বদা দূরে দূরে থাকে, একজন আর একজনের কাছে পৌঁছতে পারে না, তেমনি দ্রোণ তাকে সব উজাড় করে দিলেও, অনেক বিস্ময়, নব নব আবিষ্কারের চমক এখানও লুকনো আছে তাঁর ভেতরে। এরকম একটা ভাবনায় দোদুল্যমান হলো তার চিত্ত। সংশয়, সঙ্কোচ, ভীরুতায় ছেয়ে গেল তার মন। নিজের কাছেই তার জিজ্ঞাসা, আচার্য দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো স্পর্ধাই কারো প্ররোচনায় করবে না। ভারতের কোনো মহাবীরের যে সাহস হয় না, সেই দুঃসাহস দম্ভ দেখানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। মূর্খের মতো নিজের সুনাম, গর্ব খুইয়ে কী লাভ তার? এসব হারালে একজন মানুষের বেঁচে থাকার গর্ব কী রইল?

মহাবীর কর্ণের নির্ভয়, অহঙ্কারদীপ্ত দুটি চোখের দিকে চেয়ে অর্জুনের হৃদয় কেঁপে উঠল। এই মানুষটি তার সুনামের, গর্বের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু এর সঙ্গে মুখোমুখি কোনো লড়াই তার হয়নি। তাদের দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তার বিচার নিষ্পত্তি হয়নি। বিচারটা মহাকালের মহাফেজখানায় তোলা আছে।

একবার তো কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের অস্ত্র প্রদর্শনীর পরীক্ষায় তার সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রশংসায় যখন সবাই মুখরিত, তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে সহসা কর্ণ উঠে এল। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় সে একজন অনাহূত প্রতিযোগী হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করল। একসঙ্গে তিনটি তীর, ধনু থেকে ছুটে এসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের পদযুগল ছুঁয়ে রইল। পরক্ষণেই, আকাশে তীরের ওঁ রচনা করে

সকলের নজর কেড়ে নিল। অনুমতি কিংবা মতামতের তোয়াক্কা না করেই সবাকার চোখের সামনে তাকে (অর্জুনকে) প্রতিযোগিতায় আহ্বান করল। তার সেই দৃপ্ত মূর্তি এখনও চোখ বুজলে দেখতে পায়।

জননী কুন্তী সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ মূর্ছিত হলো। না হলে, কী যে হতো সে কথা ভাবলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় তার। কর্ণ তার বীরত্বের খ্যাতি, শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব দস্যুর মতো লুণ্ঠন করতেই এসেছিল। জননী হয়তো সেই আতঙ্কে মূর্ছা গিয়েছিল। আর কেউ না জানলেও সে জানতো। কার্যত, জননীর জন্য একটা বিরাট লোকলজ্জার হাত থেকে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল। এখনও সেই বীর খেতাব অটুট আছে। কথাটা মনে হতেই কেমন কুঁকড়ে গেল ভেতরটা। মনে হলো, অন্য কেউ না জানলেও সে জানে এই গর্ব তার চূর্ণ করে দিয়েছিল এক কিরাত। লোকচক্ষুর আড়ালে, নির্জন বনে এক বন্য-বরাহ শিকারের উপর দাবি নিয়ে কিরাতের সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে হেরে গিয়েছিল। সেই হারটা তার প্রাণে গেঁথে আছে। সেই ব্যর্থতার কথা কেউ জানে না। কৃষ্ণও না। কিরাতের কাছে হেরে যাওয়া থেকেই একটা দুর্বলতা তাকে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ করে দিচ্ছিল।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কর্ণের সঙ্গে তার অমীমাংসিত যুদ্ধ অনিবার্য। তার ও কর্ণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সেরা বীর কে—তার বিচার এখনো হয়নি। কুরুক্ষেত্রেই তার নিষ্পত্তি হবে। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ভাবলে তার সব উৎসাহ নিভে যায়। কিরাতের মতো একজন নামহীন গোত্রহীন অনার্য বীরকে অবজ্ঞা করার দাম তাকে দিতে হয়েছিল। তার কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জাটা সে ভুলতে পারেনি। পারবেও না কোনোদিন। কর্ণের কাছে অনুরূপ পরাজয়ের চিন্তা তাকে অস্থির করে। যুদ্ধ করার ইচ্ছেটাই তখন মরে যায়।

পিতামহ ভীষ্ম এই মানুষটা সম্পর্কে যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, কর্ণ যে বীর শিরোমণি তাতে অর্জুনের কোনো সংশয় নেই। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা তার কতখানি সেই সন্দেহে, দুর্ভাবনায় মনটা তার সঙ্কুচিত হয়ে রইল। কর্ণ চিরদিন বলেছে, এক আকাশে দুই সূর্য, দুই চন্দ্র যেমন হয় না, তেমনি এক ধরণীতে তাদের দু'জনের স্থান হতে পারে না। তার ও অর্জুনের মধ্যে একজনই জীবিত থাকবে। যে মানুষ এত গর্ব করে, দম্ভ করে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারে তাকে যে হারানো কঠিন আর কেউ না জানলেও অর্জুন জানে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ তার কৃতিত্ব প্রমাণ করেছিল, পাছে তার গৌরব ম্লান হয়, সুনামের হানি হয় তাই কৃষ্ণের ইঙ্গিতে দ্রৌপদী তাকে হতাশ করেছিল। কর্ণের অদৃষ্টই তাকে সাফল্যের ফল থেকে বঞ্চিত করেছিল। সেইদিন থেকে কর্ণ সম্পর্কে তার মনে একটা ভীতি আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই মানুষটার সঙ্গে তাকে একা যুদ্ধ করতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে কৃষ্ণকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখেছে। কৃষ্ণ মুখে কিছু না বললেও যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণকে সবসময় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ তার শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কালান্তক যম। কৃষ্ণও সেটা উপলব্ধি করে।

এক নিমেষে অর্জুন এত সব কথা ভাবল। বুকের ভেতর তার ঝড়ের দোলা। সেই উদ্দাম ঝড়কে প্রতিহত করার শক্তি তার ছিল না। নিরুপায় এক অসহায়তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল : সখা, আমি যে কী করব ভেবে স্থির করতে পারছি না। এলোমেলো চিন্তায় আমার মন অশান্ত। নিজেও কিছুটা বিভ্রান্ত। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ, অশ্বত্থামাকে যুধ্যমান দেখে আমার হৃদয়, মন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। গাণ্ডীব ধরার শক্তিও আমার নেই। ভয়ে বুক আমার

শুকিয়ে গেছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। পরিণামের কথা ভেবে আমার অন্তঃকরণ হাহাকার করেছে। এত মন খারাপ করা আত্মগ্লানি নিয়ে কখনো যুদ্ধ করা যায়? নিজেকে আমি শান্ত করতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। আমি নিজের কাছে নিজেই পরাজিত। আত্মার সঙ্গে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ভীষণ শ্রান্ত বোধ করছি। এই রণক্ষেত্রে আমি আর একদণ্ডও থাকতে রাজি নই। তুমি ফিরে চল। লোকে যা ভাবে ভাবুক। এ যুদ্ধে কারো মঙ্গল হবে না। চারদিকে শুধু অশুভ দেখছি।

কৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। মেঘমন্দ্র কণ্ঠে ডাকল : অর্জুন! তুমি কি পাগল হলে? স্বরাজ্য পুনরুদ্ধারের এত আয়োজন সব ব্যর্থ করে দেবে?

সখা, কৌরবদের এত বড় আয়োজন দেখে নিজেদের জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারছি কই? শুধু কৌরবদের হত্যা করলে আমরা কি সুখী হতে পারব? অনেক মৃত্যুর মূল্যে স্বরাজ্য অধিকার করে আমরা কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব? অন্তরঙ্গজনের রুধিরসিক্ত রাজ্যে আমার কোন লাভ নেই। কোনো প্রয়োজন নেই। চাই না এই শ্মশানের রাজত্ব। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। ফিরে চল।

অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ স্তম্ভিত। তবু কি আশ্চর্য নির্বিকারভাবে অর্জুনের দিকে চেয়ে রইল। তার সে চাহনি এমন তীব্র ও দুঃসহ ছিল যে অর্জুন ভালো করে কৃষ্ণের দিকে তাকাতে পারছিল না। ভর্ৎসনা করে গম্ভীর গলায় বলল : ছিঃ পার্থ! এই বিষাদ হতাশা তোমার মত বীরের শোভা পায় না। আগে যদি জানতাম, আমার প্রিয় সখা এত দুর্বল, নরম প্রকৃতির মানুষ, ভীরু, কাপুরুষ তা-হলে তোমার রথের সারথি হতাম না। কানে যা শুনছি, চোখে যা দেখছি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। একি আমার বিভ্রান্তি! স্বপ্ন! না, প্রিয় সখার কোনো কপটতা? অথবা, ভিতরটা শান্ত রাখতে কি বাইরেটা

বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে?

সখা, তুমি জ্ঞানী। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। তোমাকে শাস্ত্রের কথা শোনানো ধৃষ্টতা। তবু এই মুহূর্তে শাস্ত্রের কথা বেশি করে মনে পড়ছে। শাস্ত্রে আছে যে ঘরে আগুন লাগায়, যে লোককে বিষ খাওয়ায়, য়ে অন্যকে বধার্থে অস্ত্র ধরে, এবং যে ভূমি, ধনসম্পদ ও পরের দ্বারা আত্মসাৎ করে—সে ছয়জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্র মতে, আততায়ী বধ্য হলেও ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আচার্য বা গুরুজন যদি আততায়ীর অভিধায় পড়েন তা হলেও তাঁদের বধ করলে পাপের ভাগী হতে হবে। হত্যাকারীকে নরকভোগ করতে হয়। এ কারণেই কৌরবপক্ষের আত্মীয়-পরিজন এবং ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা আমাদের উচিত নয়। কৌরবেরা রাজ্য লোভে যদি কুলক্ষয়ের মহাপাতক হয়, তা-হলে জেনেশুনে আমরা একই অন্যায়ে প্রবৃত্ত হব কেন? কুলনাশে কুলধর্মও নষ্ট হয়।

কৃষ্ণ বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলল : পার্থ, এতই যদি তোমার শাস্ত্রজ্ঞান, কুলপ্রীতি এবং কুলনাশের ভয় তাহলে সে কথা আগে ভাবলে তো যুদ্ধই হতো না। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যখন হস্তিনাপুরে গেলাম তখন অগ্রজ যুধিষ্ঠির, মধ্যম পাণ্ডব ভীমের মতো অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারলে কই—যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। তুমি যুদ্ধ এবং সন্ধি দুই চেয়েছিলে। আসলে, তুমি ভীরু। নিজেকে ধরা দিতে চাও না। যুদ্ধের দোষ পাছে তোমার উপর পড়ে তাই মধ্যপন্থা নিয়েছিলে। তোমাকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। বলতে বলতে কৃষ্ণের ভুরু যুগল বঙ্কিম হলো। অধরে কৌতুক হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

অর্জুন চুপ করেছিল। আজকের অর্জুন অন্য অর্জুন। সমীহ হয়েই নির্ভয়ে বলল : সখা তর্ক করার মতো মনের অবস্থা নয়। কিন্তু তুমি আমাকে মিছেই অপরাধী করছ। বাস্তব যে কী ভয়ানক সন্ধির আলোচনার সময় বুঝব কেমন করে? যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার

যে মনটা ছিল, আর পরে যে মনটা নতুন করে জন্মগ্রহণ করে আমার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে-দেশকাল ভেদে তারা আলাদা আলাদা। আগের সীমাবদ্ধ মনের উপর বাইরের আলো পড়ে তা হঠাৎ বড় হয়ে গেল। ছোট স্বার্থের সঙ্গে বৃহৎ মানবিক অনুভূতির সংঘাতে মনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনের বনে ঝড় উঠলে মানুষ যে কত অসহায় বিপন্ন বোধ করে তা বাস্তব সংকটের মুখোমুখি না হলে সে টের পাবে কেমন করে? উভয় সৈন্যদলের মধ্যে না দাঁড়ালে এ আত্মোপলব্ধি হবে কোথা থেকে? এ কোন বৈরাগ্য বোধ নয়, আমার এক আত্ম-আবিষ্কার। নিজের মনকে জানার পরে আত্মীয়বধের মতো পাপাচরণ করি কী করে? সখা, প্রতিটি অনুভূতি নানা আঘাতে মন থেকে উৎপন্ন হয়। সেটাই মানুষের চরিত্র। তার মনের কেন্দ্র। এত গভীর কথা তো কাউকে বোঝানো যায় না। মন দিয়ে বুঝতে হয়। আমার আত্মাকে তোমার মন দিয়ে দেখ। মানুষের মনকে হত্যা করলে সে আর মানুষ থাকে না, দানব হয়ে যায়। তখন শুধু ধ্বংস করাই তার কাজ। যুদ্ধে আমাদের যদি জয়ও হয় ; স্বজন হারানো মৃতদেহের ধ্বংসস্তূপের উপর কোন স্বর্গরাজ্য গড়ব? যাদের জন্যে রাজ্য জয় তারাই যদি নিহত হয়, তাহলে যুদ্ধ করে কি হবে? জয়ের পরে কাদের নিয়ে রাজ্য ভোগ করব? সখা, রাগ কর না। এসব আমার বিশ্বাসের কথা, অনুভূতির কথা।

অর্জুনের কথায় কৃষ্ণ চমকাল। থমকে তাকাল তার দিকে। দু'চোখের তারায় বিস্ময়। এই অর্জুন তো তার চিরচেনা অর্জুন নয়। যাকে নিয়ে তার গর্ব ছিল, সে আর কপিধ্বজ রথের অর্জুন কি একই ব্যক্তি! কৃষ্ণের মনে একসঙ্গে অনেক প্রশ্নের উদয় হলো। সেই সঙ্গে কিছুদিন আগে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে রওনা হওয়ার বিচ্ছিন্ন কিছু দৃশ্য এবং ঘটনা চোখের তারায় জ্বল জ্বল করতে লাগল।



সন্ধির শেষ চেষ্টা করে দেখতেই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দূত করে পাঠালো। সন্ধিটা পাণ্ডবেরা নিজেদের স্বার্থেই চেয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা কখনো সমানে সমানে নয়। তাই, পরাভবের আশঙ্কায় ভুগেছিল তারা। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে যে কৃচ্ছ্রসাধন করল অশেষ কষ্ট ভোগ করল দুর্যোধনের অনমনীয় আচরণে কার্যত তা অর্থহীন হয়ে গেল। সন্ধির প্রস্তাবকে দুর্যোধন তাদের দুর্বলতা বলে ভাবল। তাই সন্ধির কোন প্রস্তাব মেনে নিল না। যুদ্ধের জয়-পরাজয়েই তার মীমাংসা চাইল। তথাপি, যুধিষ্ঠির তার শুভবুদ্ধি উদ্রেকের জন্যে দু'পক্ষের আত্মীয় এবং সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য কৃষ্ণকেই দূত করে হস্তিনায় পাঠাল।

যুদ্ধকে এড়ানোর জন্যেই যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের উপর তাদের অধিকারের প্রতীক হিসাবে পাঁচ ভাইয়ের জন্যে পাঁচখানি গ্রাম দাবি করল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা দুর্যোধন কতখানি মেনে নেবে কৃষ্ণের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অসঙ্কোচে কৃষ্ণ সে কথা বললও : ধর্মরাজ তোমার ক্রুদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ইন্দ্রপ্রস্থের উপর অধিকার দাবি করা তোমার কোনো অন্যায় নয়।

একজন মানুষের অধিকার দাবি করায় কোনো জোর যদি না থাকে ; সে মানুষই না। দীর্ঘদিন ধরে তোমরা নীরবে তার অনেক জুলুম, অত্যাচার সহ্য করে আসছো। তোমার স্বপ্নের ইন্দ্রপ্রস্থকে কেড়ে নিয়ে উদ্বাস্তু করেছে। আশ্রয়ের জন্য থিতু হয়ে বসার জন্য, নিজের মতো থাকার জন্য একখণ্ড জমি চাওয়া কোনো অন্যায় নয়। অধিকারের প্রতীক হিসাবে দুর্যোধন কি পাঁচখানি গ্রাম ছাড়বে? ধর্মরাজ ; অধিকার কেউ ছাড়ে না। ফিরিয়েও দেয় না। অধিকার কারো করুণা কিংবা ভিক্ষার দান নয়। যুদ্ধ করে অধিকার অর্জন করতে হয়। অধিকার কেড়ে নেয়ার বস্তু। যে তা পারে না, সে কোনোদিনই অধিকার ভোগ করতেও জানে না। যারা যুদ্ধবিমুখ, যুদ্ধে ভয় পায়, অধিকার কখনও সেইসব সংগ্রামী ভীরু মানুষের জন্য নয়। ধর্মরাজ, সে কথা জেনেও যুদ্ধের দোষ এড়ানোর জন্যেই সন্ধি করতে চাওয়া কোনো খারাপ কাজ নয়। কিন্তু অন্য এটাকে দুর্বলতা বলেই গণ্য করবে। তার চেয়ে জঙ্গি মনোভাব নিয়ে ক্রোধ, অসন্তোষকে বোঝানোটা বেশি জরুরী। তার ভেতর পৌরুষ আছে।

কৃষ্ণের কথাগুলো ভীষণ সত্য বলে মনে হয়েছিল অর্জুনের। যুদ্ধের জয়-পরাজয় সব সময় বাহুবল, সৈন্যদল, অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করে না। তা হলে তো মথুরায় কংসের অত্যাচারী শাসনের অবসান হতো না, জরাসন্ধের বিশাল বাহিনী মুষ্টিমেয় মথুরাবাসীর হাতে পর্যুদস্ত হতো না। বুদ্ধিবলে এবং কৌশলের দ্বারা অল্পসংখ্যক লোকক্ষয় ঘটিয়ে যে এক বিশাল জয় আদায় করা যায় কৃষ্ণ নিজের রাজনৈতিক জীবনে সে জয়লাভ করে বারংবার তা দেখিয়েছে। মনের শক্তিকে সংহত করার ভেতর আত্মশক্তির যাদু লুকনো আছে।

মানুষের জীবনে কত কি অসম্ভব ঘটনা আচমকা ঘটে যায়; মানুষ নিজেও জানে না। তার মধ্যস্থতায় হঠাৎ কিছু যদি ঘটে যায়

তাই হস্তিনাপুর যাত্রার আগে কৃষ্ণ পঞ্চ-পাণ্ডবকে একত্র করে তাদের প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া জানল।

ভীমই কৃষ্ণকে সবচেয়ে বেশি অবাক করল। সন্ধির প্রস্তাবে ভীম পূর্বের ক্রোধ, প্রতিহিংসা, দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে কেমন নির্বিকারভাবে বলল : সখা যুদ্ধ নয়, সন্ধিই আমার কাম্য। ক্রোধ ও জঙ্গি মনোভাব নিয়ে আসে প্রতিহিংসার রাজনীতি। তারা আমাদের উপর অনেক অন্যায় করেছে, আমাদের সম্মানহানি করেছে, তবু তার প্রতিশোধ নেওয়ার সময় নয় এখন।

কিন্তু কৃষ্ণ নিজে যুদ্ধ চেয়েছিল। বহুকাল ধরে রাজ্যের উপর দাবি ও অধিকার নিয়ে কৌরব-পাণ্ডবের বিরোধের অবসান একমাত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয়েই সম্ভব। অর্জুনও সে কথা বুঝেছিল। তবু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল সে। বলল তুমি যাচ্ছ—যাও। তুমি যে খুব সফল হবে, তাও মনে হয় না। তথাপি, কোনো অসাধ্য সাধন যদি করতে পার, তাহলে সবচেয়ে খুশি হবো আমি। যুদ্ধ যদি হয় তাতেও অসম্মতি নেই আমার। যুদ্ধে মঙ্গল-অমঙ্গল দুই-ই আছে। অমঙ্গলের আতঙ্কে যুদ্ধে বিরত হলে মঙ্গলটা আসবে কোন পথে? অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণকে পেতে হলে অনেক মূল্য দিতে হয়। দেশ-কাল পরিস্থিতি মতো যা করলে ভালো হয় তাই কর।

পঞ্চপাণ্ডবের ভেতর কেবল সহদেব একটু আলাদা। তার প্রতিবাদের ভাষা ছিল তীব্র জ্বালাময়ী। বলল : হ্যাঁ, আমি ক্রুদ্ধ। অত্যাচারে অসহ্য হয়ে একটা পোকাও রুখে দাঁড়ায়। তুমি কি তার থেকেও আমাদের অধম ভাব? কৌরবদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই তো সময়। সর্বভারতীয় ঐক্যের বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর এমন বিরোধের চেহারা আগে কেউ দেখেনি। আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেউ প্রতিহিংসার রাজনীতি বলবে না। এ হলো বঞ্চনা, অপমান, অসম্মানের বিরুদ্ধে মুক্তির

লড়াই। এ লড়াই যাতে হয় তুমি তার চেষ্টা কর। দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথের কথা ভুলতে পারে মধ্যম পাণ্ডব। কিন্তু আমি ওর মতো উদার নই। যুদ্ধে নিহত হলে কিংবা হেরে গেলেও স্ত্রীর অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটা প্রতিবাদ তো জানান দিতে পারব। পতির কিছু কর্তব্য তো করা হবে। কিন্তু সন্ধি হলে সেই সান্ত্বনা তো থাকবে না।

সহদেবের কথাগুলো কৃষ্ণকে শুধু চমৎকৃত করল না, তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। নিজের মনে সহদেবের কথাগুলো নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল : সর্বভারতীয় বিরোধী ঐক্যের এমন চেহারা আগে কেউ দেখেনি। কথাটা একটু অতিরঞ্জিত ছিল না। বোধহয়, এর চেয়ে বাস্তব সত্য কিছু নেই। এই যুদ্ধের নেপথ্য রাজনীতি হলো জাগরণ। সর্বভারতীয়স্তরে আর্যত্ববোধের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এক জাতি, এক প্রাণ আদর্শ জাগিয়ে তোলার জন্য, আর্যমনকে নাড়া দেওয়ার জন্য কুরু-পাণ্ডবের লড়াইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের আর্যরা যে সবাই যযাতির রক্তধারা বহন করছে, সেই চেতনাকে আবিষ্কার করে ঐক্য চেতনায় ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের। যযাতির পুত্রেরাই নানা গোষ্ঠী, বংশে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে রাজত্ব করছে। সেই সত্য বিস্মৃত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বলশালী রাজ্যগুলো অধীনতার নাগপাশে বন্দী করে কার্যত তাদের সুখ, স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করছে। একটা বিরাট সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী শক্তির অবিচারে, অত্যাচারে, পাপে, অধর্মে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে সচেতন করতে এবং নিজের অধিকার ও ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, প্রত্যেকের আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে, আত্মবোধ ফিরিয়ে

আনতেই এই বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এই সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে তারা নিজেদের আবিষ্কার করবে। একই আত্মার সুরে সুর মিলিয়ে নিজেদের হৃৎস্পন্দনের মধ্যে অনুভব করবে তাদের ধর্ম এক, ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, তাদের রক্তের বন্ধনও এক। অনৈক্য, বিরোধ কাটিয়ে তাদের নিছক কাছাকাছি আনার জন্য যে ঐক্যের আয়োজন তা নয়, প্রয়োজন সৌভ্রাত্রবোধ জাগিয়ে তোলা, অখণ্ড ভারত রাজ্য গঠনের জন্য আর্যসংস্কার, ও চেতনাকে নাড়া দেওয়া। এই কাজে ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে বিচ্ছিন্ন মানুষকে একসূত্রে গাঁথার উপরেই জোর দিল কৃষ্ণ। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি নয়, প্রতিশোধ নয়, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার পবিত্র সংকল্প নিয়ে অধর্মের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে, অত্যাচারের সঙ্গে, বঞ্চনার সঙ্গে যুদ্ধ করে অন্যায়কে ধ্বংস করতে চেয়েছে কৃষ্ণ। কিন্তু যেখানে শত শত বছর ধরে বিরোধ, বিভেদের অনৈক্য ও শত্রুতা জমা হয়ে আছে, সেখানে ঐক্যের স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন।

কৃষ্ণের বিশ্বাস, বিরোধ বিভেদের সমস্ত ভালো-মন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবনে ঐক্যের বোধ পূর্ণ হয় না। এই উপলব্ধির জন্য একটা মানুষকে সারা জীবন পথ চলতে হয়। অনেক ত্যাগ, দুঃখ, কষ্টের পাহাড় পেরিয়ে হাসি-আনন্দের উপত্যকা দিয়ে ঐক্যের দেশে পৌঁছতে হয়। সব ঐক্যের রূপ এক রকম নয়। তাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ঐক্যের ভিত্তিও হতে পারে ভিন্ন। পঞ্চপাণ্ডবের সৌভ্রাত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে, ঐক্য ও সংহতি চেতনায় দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পাঞ্চালীকে পাঁচভাই বিয়ে করেছে। তেমনি, ভারতীয় আর্যদের ঐক্যবদ্ধ করার কৃষ্ণের রাজনীতিটাও একটু অন্য রকম। বিরোধের মূলোৎপাটন করে ঐক্যের বীজ বপনের জন্য চাই মহাশ্মশানের মতো সাম্যের

জায়গা। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ঐক্যের জায়গা আর নেই। ধর্মক্ষেত্ররূপী কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ তার এক নতুন দিগন্ত সূচনা করবে।

আমায় কিছু জিগ্যেস করবে না সখা? পাঞ্চালীর জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ একটু চমকে উঠেছিল। তার অভিভূত ভাবটা কেটে গেল নিমেষে। কিন্তু পাঞ্চালীর এ কোন রূপ দেখছে কৃষ্ণ? তার দুই চোখ ক্রোধে, অপমানে, প্রতিহিংসায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। পাগলিনীর মতো আলুলায়িত কেশে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর মুখে পুনরায় বলল : কথা বলবে না সখা?

সখী, আমাকে তোমার কোনো প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো প্রয়োজন আছে তোমাকে।

পাঞ্চালী স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হঠাৎই আলেয়ার আলোর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল : মিছে কথা। পাণ্ডবদের দাবি মেটাতে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। ভীমার্জুনসহ ধর্মরাজ ভিক্ষুকের মতো আজও দুর্যোধনের অনুকম্পার কাঙাল। তাদের ভীরুতায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এরা আমার স্বামী! এ কথা মনে করতেও আমার ঘেন্না হয়। অপমানের গ্লানিতে বুক পুড়ে যাচ্ছে আমার। চরম দুঃসময়েব বন্ধু শুধু তুমি। আমার মনের একাকিত্বের যন্ত্রণা তুমি বুঝবেই। দুঃশাসন যে হাতে আমার কেশ আকর্ষণ করেছিল, সেই হাত কবে ভূলুণ্ঠিত দেখব? দুর্যোধন যে জানুতে আমাকে উপবেশন করতে আহ্বান করেছিল তার ভগ্নরূপ কবে দেখব? বিনা যুদ্ধে তো আমার প্রত্যাশা পূরণ হবে না। আমার বুকের আগুন নেভানোর জন্যে অনেক রক্ত চাই সখা। জ্যৈষ্ঠের ফুটিফাটা মাঠ যেমন আষাঢ়ের বর্ষণের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে, আমিও তোমার মুখে রক্ত ঝরানো যুদ্ধের সংবাদ শোনার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করব।



কৃষ্ণের ভেতরটা চমকে উঠল। আত্মবিস্মৃতির জগৎ থেকে সহসা বাস্তবে ফিরল। মনের কথা মনই জানে। সে কথা কাকে বলবে? প্রশ্নয় ভরা উজ্জ্বল দুটি শান্ত আঁখি মেলে অর্জুনের দিকে চেয়ে রইল। গভীর সেই দুটি চোখ অর্জুনকে নয়, অর্জুনের আত্মাকেই খুঁজছিল। তার ভেতরের প্রতিক্রিয়াকে যেন চিরে চিরে দেখল। ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে হৃদয়ধর্ম ও নীতিধর্মের বিরোধে তার সত্তা দ্বিখণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ করা এবং না করার প্রধান সংঘাতে সে কর্তব্য নির্ণয় করতে পারছিল না। স্বজনবধ এবং গুরুজনবধের দুর্বলতাই তাকে যুদ্ধ না করার দিকে বেশি করে টানছিল। এটা অর্জুনের কোন দোষ নয়, মনের ধর্ম। মনের ভেতর কত যে মেরু আছে, মানুষ নিজেও জানে না। সেইসব মেরুর রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। কারণ তার জন্যে চাই গভীর আত্ম-অন্বেষণ, ধৈর্য এবং সংযম। এর জন্যে অনুশীলন দরকার। পাণ্ডবেরা সারাজীবন ধরে তা অর্জন করেছে। রাজ-ঐশ্বর্যের লোভ মোহ ত্যাগ করে যারা বনে বনান্তরে গুহাবাসী সাধকের মতো দিনযাপন করেছে—কোনো অবস্থায় ধৈর্যহীন কিংবা উদ্যমহীন না হয়ে শুধু কর্মের জন্যে কর্ম করে গেছে তাদের

অপেক্ষা বড় কর্মযোগী কে হতে পারে? সুদীর্ঘ বনবাসের জীবনে নানারকম সংকট সংস্যার মুখোমুখি হয়েও যারা কর্তব্যে ও কর্মে অবিচল থেকেছে, তাদের মতো সংগ্রামী মানুষের উপর ভরসা করেই তো এক নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে। সেই সাধ পূর্ণ করতে যার উপর বেশি নির্ভর করেছিল সেই তৃতীয় পাণ্ডব যুদ্ধের ব্রাহ্মমুহূর্তে এমন একটা মানসিক সংকটে আর্ত হয়ে যে কর্তব্যবিমুখ হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কৃষ্ণ।

অর্জুনের চিত্তবৈকল্য দূর করার জন্যই কৃষ্ণ মনের মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তার এত কথা মনে হলো। শান্ত গভীর গলায় বলল : অর্জুন, তোমার মনে পাপবোধ জন্মানোর মতো কোনো কারণ ঘটেনি। তবু তুমি কাতর স্বরে 'ক্ষমা কর' বলে আমার দুহাত ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করছ। দুর্বল ভীরু স্বধর্মচ্যুত মানুষকে ক্ষমা করাও পাপ। মার্জনা চাইতে তোমার লজ্জা করল না! আত্মসম্মানবোধ থাকলে ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে আত্মহত্যা করতে। তোমার এই আত্মদ্রোহের কোন ক্ষমা নেই। তুমি স্বার্থপর। নিজের কথাই শুধু ভাবছ। যারা তোমাদের পক্ষ নিল তাদের কথা ভাবার একবারও প্রয়োজন বোধ করলে না। নিজেকে নিয়ে একজন মানুষ যা খুশি করতে পারে। কিন্তু তুমি এখন আর নিজের নও। তোমার স্বার্থ, সুখ বলে কিছু নেই। তুমি একটা বিরাট আদর্শের কাছে, সত্যের কাছে দায়বদ্ধ। দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়ার মতো কোনো কাজই তোমার শোভা পায় না। তুমি এখন নিজের জন্য বাঁচছ না, পাণ্ডবদের জন্যই বাঁচছ। তোমার যা কিছু সব পাণ্ডবদেরই। তাদের সেনাপতি তুমি। যুদ্ধই তোমার ধ্যান-জ্ঞান! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হলো কালের নির্দেশ, ঈশ্বরের আদেশ। কৌরব-পাণ্ডব উভয়ের নিয়তি। যুদ্ধ না করে পালাবে কোথায়?

অর্জুন আস্তে আস্তে নম্রভাবে বলল : পালাতে চাইনি। আবার, ও বোঝাতে পারছি না। বিবেকের যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। মনের এ রক্তক্ষরণ কোনো প্রবোধেও বন্ধ হওয়ার নয়।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধনের সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, তারা শত্রু তোমার। শাস্ত্রে বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শত্রুকেও অল্পদলন করে ছেড়ে দিতে নেই। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। তোমার অনুভূতিপ্রবণ মনের কিছু কিছু ভাবাবেগ দিয়ে এদের দেখছ। কিন্তু শত্রু কখনো আত্মীয়, বন্ধু, হিতৈষী হয় না। তোমার প্রতি স্নেহ-প্রীতির সেই মনটা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের আগেই মরে গেছে। মনের মৃত্যুও এক ধরনের মৃত্যু। সুতরাং তাদের নতুন করে মৃত্যু ঘটানোর কিছু নেই। তোমার ভাবান্তর নিছকই একটা বিভ্রান্তি। নিজেকে বিভ্রান্ত করে শক্তির অপচয় করা এক ধরনের আত্মহত্যা। মনের এ দুর্বলতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

কৃষ্ণের কথার কোনো উত্তর দিল না অর্জুন। চুপ করে থাকল। চুপ করে থাকাটা যে মেনে নেয়া নয়—এ কথাটা মুখ ফুটে অর্জুন কোনোদিন বলতে পারল না। সব কথা তো আর সব জায়গায় বলা যায় না। অনেক কথাই থাকে যার উত্তর দেওয়া মুশকিল হয়। কিন্তু কথাগুলো মনের ভেতর ঝড় তোলে। একটা চাপা কষ্ট নিয়ে গুমরোয়। তখন সত্যি বড় অসহায় লাগে। নিজের দুর্বলতার জন্য একটা বড় মিথ্যেকে নিঃশব্দে স্বীকার করার জন্য নিজেকে মিথ্যাচারিতার অপরাধে অপরাধী করতে হয়। যদিও এসব নিয়ে কখনো আগে মাথা ঘামায়নি। ঘামানোর কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু আজ তার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগল পাণ্ডবদের নিয়ে কী করতে চায় কৃষ্ণ? তার মহাভারত পরিকল্পনা কীভাবে হবে? তার সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি গড়তে জোট-নিরপেক্ষ, নির্বান্ধব, অজাতশত্রু পাণ্ডবেরা কী পরিমাণ তার কাজে আসবে ;

পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দেবার আগেই কৃষ্ণ ভেবেচিন্তে তার একটা ছক তৈরি করেছিল।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অর্জুনের হঠাৎ মনে হলো, কৃষ্ণ সেই ছক অনুসরণ করে ভার্গব গৃহে তাদের পরম আত্মীয় হয়ে এল ; ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া দিতে। তার অকপট আন্তরিকতায় এমন মুগ্ধ হলো তারা যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণ তাদের সখা হয়ে গেল। তারা, আর নির্বান্ধব রইল না। স্বজনহীনও না। তাদের এই একান্ত নির্ভরতার মূলে ছিল নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের দাবি। স্বাধীনতা ও অধিকার সুরক্ষা করা এবং স্বরাজ্য উদ্ধারের প্রত্যাশা। কৃষ্ণও তাদের দুর্দিনে, আত্মপ্রকাশের সন্ধিক্ষণে অনুগত বান্ধব ও পরম আত্মীয়ের মতো পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কৃতজ্ঞ করেছে আর তারা লোভীর মতো, কাঙালের মতো, স্বার্থপরের মতো তার কাছে এত চেয়েছে যে কৃষ্ণের স্বার্থপরতাকে বুঝতে পারেনি। কৃষ্ণ তাদের বন্ধু হয়ে, আত্মীয় সেজে তাদের কৃতজ্ঞতাকে মূলধন করে নিজের স্বার্থ, সাফল্য ও আকাঙক্ষা পূরণ করেছে। অজাতশত্রু পাণ্ডবদের জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতিকে আড়াল করে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ পুরুষের গৌরব অর্জন করেছে। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এই পরম সত্য কথাটি কৃষ্ণ জানলেও পাণ্ডবেরা কোনোদিন জানতে চেষ্টাও করেনি। কৃষ্ণের অনুগত থেকে ধন্য হয়েছে তারা। কৃষ্ণের দয়া, অনুগ্রহের ঘরে কৃতজ্ঞতার তালা দিয়ে তাদের স্বাধীন ইচ্ছে মতামতকে বন্ধক রেখেছে—এই আশ্চর্য সত্যটি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে হঠাৎই অর্জুনের মনকে ভারাক্রান্ত করল। কেন করল কে জানে? এরকম একটা অদ্ভুত চিন্তার উৎস কোথায় অর্জুন জানে না। তবে সব কিছুরই তো একটা কারণ থাকে। তারা দুর্বল, কৃষ্ণের মুখাপেক্ষি বলেই হয় তো এসব আজেবাজে কথায় মনটা বিষণ্ণ হচ্ছে। তাই জোর করেই ঐ সব আবোল-তাবোল ভাবনা মন

থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সন্দেহ এমন এক জিনিস— একবার শুরু হলে তা আর মন থেকে তাড়ানো যায় না।

ঘুরেফিরে তার মনে হলো, একেবারে শেষ মুহূর্তে দুর্যোধনও যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর আসছে শুনে সে একটু স্বস্তিবোধ করছিল। বহু প্রত্যাশা নিয়ে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে যাতে আলোচনা সার্থক ও শান্তিপূর্ণ হয় তার তাগিদে সে নিজে গিয়েছিল কৃষ্ণকে পরম সমাদরে হস্তিনাপুরে আনতে। কিন্তু তার আন্তরিক সহৃদয় আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করল কৃষ্ণ। কটুবাক্যে অপমানও করল তাকে। ভালো করে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। তার আত্মাভিমানকে আঘাত করার জন্য বলল : পাণ্ডবের শত্রু আমারও শত্রু। আত্মীয় হলেও আমার শত্রু। শত্রুকে বিশ্বাস করে তার গৃহে অবস্থান করার বিপদ অনেক। আপৎকালে শত্রুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে শাস্ত্রেও বারণ আছে। রাজসভার বাইরে তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলব না।

প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে দুর্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল তার দিকে। অর্জুন কল্পনায় দুর্যোধনের অসহায়, অভিমান-আহত, অপমানিত মুখখানিকে দেখছিল। আব কৃষ্ণ বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তার দুর্জয় অভিমানকে ছিন্নভিন্ন কবে দিল। কৃষ্ণের অপমান ভুলে যুধিষ্ঠিরের সন্ধি প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া কোনো রাজার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সন্ধির প্রস্তাবকে প্রহসনে পরিণত করতে এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের বাতাবরণ তছনছ করতেই সশস্ত্র বাহিনীতে সুরক্ষিত হয়ে কৃষ্ণ কৌরব সভায় গিয়েছিল। মুখে শান্তির কথা বলে পরক্ষণে যুদ্ধের হুমকিও। শান্তির দূতের এ এক অদ্ভুত সন্ধির প্রস্তাব। পরোক্ষে কৃষ্ণ যুদ্ধের উত্তেজনাই ছড়িয়েছিল। তাই সন্ধিটা শেষ পর্যন্ত আর হলো না।

এসব জেনে মন খারাপ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। কৃষ্ণের কার্যের কড়া সমালোচনা কিংবা তার প্রতি বিদ্রোহ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য যে তাদের নেই কৃষ্ণ জানতো। তাই নিজের স্বার্থ ও লক্ষ্য সিদ্ধির কথা ভেবে, নিজের এবং যাদব গোষ্ঠীর হৃত রাজনৈতিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণ দূতের কর্তব্য করেনি। পাণ্ডবদের স্বার্থ সুবিবেচনাব অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলেনি। অথচ সে সুযোগ যথেষ্ট পেয়েছিল কৃষ্ণ। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করল না। নিজের স্বার্থেই করেনি। তাদের মুখাপেক্ষিতার সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণ কিছুটা অবিচার করেছিল! তার রাজনীতির কপট কদর্যতা তাকে ক্ষুব্ধ করল। বেশ একটু রাগ হলো। অর্জুনের কথাবার্তায় তর্কে তার আঁচ লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ অসহিষ্ণু হয় না। তার প্রতিবাদী মনের সব উত্তাপ নিঃশেষে শুষে নিয়ে সে তাকে নিজের করে নেয়। আর তখনই তার ভেতরটা চমকায়। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা লজ্জাগুলো অনুশোচনা হয়ে ডানা ঝাপটা-ঝাপটি করে, আর অস্ফুটে কী যেন বলে।

অর্জুনকে ভীষণ মৌন এবং বিভ্রান্ত দেখে কৃষ্ণ বেশ একটু উদ্বিগ্ন হলো। অন্যমনস্কতা থেকে তার সমস্ত চেতনাকে আহরণ করে আনার জন্যে কৃষ্ণ বলল · সখা, হৃতসর্বস্বা, লাঞ্ছিতা ব্যথাতুরা ধরণী শিশুর মতো অসহায় দৃষ্টি মেলে তোমার দিকে চেয়ে আছে। পরিব্যাপ্ত, নিখিলের মধ্যে কী ভীষণ মৌন এবং বিষণ্ণ সে। কে ঘোচাবে তার দুঃখ? কে শোনাবে তাকে অভয়বাণী? একমাত্র তোমার বীর্যবত্তাই পারে ধরণীর জ্বালা জুড়োতে। এ পৃথিবীতে লোভের বঞ্চনা, লাঞ্ছনার জ্বালা, অপমানের বেদনা, অত্যাচারের কষ্ট, অধিকার হরণের যন্ত্রণা তোমার আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তাই, এ মহারণে তুমি রথী, আমি সারথি।

অর্জুনের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, সখা, তোমার বাক্‌জালে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক আচ্ছন্ন করে দিও না। তুমি আমার পরমহিতৈষী। মহাযুদ্ধের ঘাতক হতে বলো না আমায়। মানুষের এত বড় সর্বনাশ করতে পারব না আমি। হিংসা করে মনের আক্রোশ মেটানো যায়, শত্রুর অশেষ ক্ষতি করা যায়, কিন্তু তাতে মানুষের কোনো মঙ্গল হয় না। হিংসার মতো মানুষের বড় শত্রু আর নেই। হিংসা করে জয়ী হওয়া যায়, কিন্তু সুখ পাওয়া যায় না। আনন্দের ঘর ভরে ওঠে না। সখা, একবারও কি ভেবেছ, যুদ্ধ বাধলে কত লোক গৃহহীন হবে, কী বিরাট কুলক্ষয় হবে? কত রমণী স্বামী হারাবে, কত শিশু পিতা হারাবে, কত জননীর বুক শূন্য হবে? এসব কথা কি একবারও মনে হচ্ছে না তোমার? তুমি তো এত নিষ্ঠুর ছিলে না কোনোদিন? পরিণামের কথা ভেবে কাজ না করলে পরে শুধু দুঃখই বাড়ে। মনস্তাপ জন্মে। ফলের কথা ভেবেই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নিষ্ফল কর্ম কে কবে করেছে? আমরাও যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি সেও তো ফলের আশায়। যুদ্ধে জয় হলে আমরা আবার রাজ্য পাব, সিংহাসন পাব। আমাদের সুখ, স্বপ্ন, সাধ, ঐশ্বর্য সব উথলে পড়বে। একজন বণিকও বিপুল ধনোপার্জনের আশা নিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসায়। মাও সন্তানকে পালন করে ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে। সখা আশা, প্রত্যাশা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়েই একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে বলেই জীবনটা থেমে থাকে না। নদীর মতোই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে সাগরের দিকে অনন্ত বিস্তৃতির প্রত্যাশায়। সখা, মানুষের জীবনও অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা। কখন কার প্রতি সে আকৃষ্ট হচ্ছে নিজেও ভালো করে জানে না। সৃষ্টির মধ্যে যেমন নিরন্তর রূপান্তর হচ্ছে। মানুষেরও তেমনি ভাবান্তর ঘটছে অহরহ। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কেউ থেমে থাকে না। নিজেকে শুধু প্রসারিত করতে চায়।

অনন্তের মধ্যেই সে মুক্তি চায়।

কৃষ্ণের দু'চোখে অনন্ত বিস্ময়। মুখে মুগ্ধতা। অধরে নিঃশব্দ হাসির আভাস। অর্জুনের ভেতরের অস্থিরতাকে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর গভীরভাবে অনুভব করল। অর্জুনের অনুভূতিপ্রবণ মনের অভ্যন্তরে তার বিবিধ বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেছে। মনের আকাশে কোথায় যেন সূর্যোদয় হচ্ছে। যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠে তার চোখের পাতা যেন খুলল। কৃষ্ণের মনে হলো তার চিত্তের জাগরণের আর খুব দেরি নেই। শিগ্রী একটা কিছু রূপ নেবে। জ্ঞানের ঘরে পৌঁছনো আর অল্পমাত্র পথ বাকি অর্জুনের। ছোট আমি থেকে বড় আমির পাহাড়চূড়ায় পৌঁছে গেলে অর্জুনের আর কোনো গন্তব্যই থাকবে না। তখন সে আত্মস্থ হবে। যোগস্থ হলেই নিজের মধ্যে বিরাটকে দেখবে। সেই দেখার মন তৈরির হতে সময় লাগে। অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতি ভালো-মন্দ জ্ঞান, সংশয়-অবিশ্বাসের সহস্র জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে না গেলে তো জীবনবোধ পূর্ণ হয় না। ভীরু জীবনের অন্ধকার গহ্বর থেকে চিত্ত উন্মেষের আলোকিত প্রান্তরের দিকে অর্জুনের মনও তেমনি নিঃশব্দে এগোচ্ছে। কৃষ্ণ অনুভূতির মধ্যে স্পন্দন শুনতে পেল। বাইরে তার যাত্রাকে চোখে দেখা যায় না। কেবল মন দিয়েই তাকে অনুধাবন করা যায়।

অর্জুনের নিঃশব্দ পরিবর্তনের উপর চোখ রেখে, তার মনের মনটাকে বুঝেই বলল : এত বুঝেও কিন্তু নিজের বোঝাটাকে কাজে লাগালে না। পাপ-পুণ্যের ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না। অথচ, তুমি বলছ, মানুষের ভাবান্তর ঘটছে অহরহ। অনন্তের মধ্যে সে মুক্তি চায়। কিন্তু তোমার নিজের বেলায় সে মুক্তি কোথায়? যে পাপ-পুণ্যের উপর তোমার বিন্দুমাত্র হাত নেই, যে উদ্ভূত দুষ্কর্মের জন্যে এই মহাযুদ্ধ হচ্ছে

এবং যার কিছুমাত্র দায় তোমার নেই—তার পাপের বোঝা আর পুণ্যের আনন্দের জন্যে তুমি ব্যাকুল হচ্ছ কেন? জীবনের আসল মানেটা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল মুক্তি। অথচ বেশির ভাগ মানুষের কাছেই জীবন একটা বন্দীদশা। মায়া, মোহ, ভালোবাসা, অন্ধ শ্রদ্ধায় কর্তব্য ভুলে, দায়িত্ব এড়িয়ে কলুর বলদের মতো, মনের চোখ ঢেকে রেখে জীবনকে পিষে পিষে তুমি শুধু কৈফিয়ত বার করছো. সান্ত্বনা খুঁজছো। মাথার উপর এত বড় যে আকাশ, সে কি তোমার মনটাকে বড় করে দেয় না? চারদিকে এত আলোর ছড়াছড়িতেও কি তোমার মনের অন্ধকার দূর হয় না? এত হাওয়া তোমার অন্তরে মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেয় কৈ? এত বড় প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়েও যদি নিজেকে বিস্তৃত করতে না পারো তাহলে তুমি করুণারও অযোগ্য! কেন যে পুরনো একঘেয়ে অভ্যেসের বাঁধন কেটে তুমি বেরিয়ে আসতে পারছ না—বুঝি না। সখা, তোমার কি একবারও মনে হয়নি, যে, সকলেই যা করে এসেছে, চিরদিন, তাকে মেনে নেওয়ার আগে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে একটু বিচার করে দেখা উচিত ছিল। যে কথা আমি ভাবছি, নিজের জন্যে নয়, বিশ্বের মানুষের জন্যে—সে কথা তোমার মনে উদয় হলো না কেন? তুমি তো কোনো কিছুতে আমার চেয়ে কম নও। তুমি আমি চিবদিন একসাথে আছি। তবু এমন কী হলো যে, সেই সত্যটা তুমি বিস্মৃত হলে? এটা কী বিস্মৃত হওয়ার সময় যুদ্ধ বাস্তব সত্য। সামনে কর্তব্যের আহ্বান। ভাবাভাবির এখন সময় আছে কি? ভাবাভাবির নামে নিজেকে নিবৃত্ত করার এই ছলনা তো আত্ম-বিদ্রোহ।

কথাগুলো বলা শেষ করে কৃষ্ণ একটু থামল। আড়চোখে অর্জুনকে দেখল। খুবই আশ্চর্য লাগল। অর্জুন কত শান্ত, নির্বিকার এবং ভাবলেশহীন। তার কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই। অথচ, কৃষ্ণের খুব গর্ব ছিল প্রত্যেক মানুষই তার সংস্পর্শে ধীরে

ধীরে তার মতোই হয়ে ওঠে বোধ হয় অজানিতে, অসাবধানে অথবা সচেতনভাবেই। কিন্তু কখন যে তার স্বভাবটা বদলে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে ওঠে সে নিজেও জানে না। অর্জুনই কেবল একটু আলাদা। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি তার কথাগুলোরও একটা দিক আছে। অর্জুনের কথা মেনে নিলে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষের মতো হাতে পায়ে শিকল পরে দুবেলা দুটো খেতে পাওয়ার লোভে নিজের ক্ষুদ্র ঘরটিতে বসে শান্তিতে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। এবং এই প্রত্যাশাটুকু ভর করেই 'বেশ আছি' বলে বেঁচে থাকাও একরকমের বাঁচা। যার যোগ্যতা নেই, যে ভীরু, দুর্বল, তার পক্ষে এর চেয়ে বেশি চাওয়া হয় না। অর্জুনের কাছে এরকম হীনম্মন্যতা নিয়ে, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নির্লজ্জ বাঁচার কথা ভাবলেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে কৃষ্ণের। অর্জুনের স্বধর্ম বিচ্যুতিতে ভীষণ ভয়ের এক অনুভূতি হলো। নিজেকে ভীষণ বিপন্ন এবং একা বোধ হলো কৃষ্ণের। কেমন একটা অসহায়তাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করল। সে কিছুই স্থির করতে পারছিল না। অর্জুনের ওপর তার ভীষণ রাগ হলো।

কৃষ্ণ অবাক হয়ে লক্ষ্য করল অর্জুন গালের ওপর হাত রেখে থিতু হয়ে বসে আছে রথেতে। তার কোন অভিব্যক্তি নেই। এক অতলান্ত বিষাদে সে ভারাক্রান্ত। তার নীরবতা এক অভাবিত শূন্যতায়, অস্থিরতায় তাকে স্তব্ধ করে রাখল। কোন্ বিকল্পে সেই অভাব পূরণ সম্ভব, তার চিন্তায় কৃষ্ণও বিভোর। অর্জুনের মনটাকে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে মগ্নতা থেকে বাস্তবে ফেরানোর জন্যেই রূঢ় কণ্ঠে বলল : সখা, তুমি নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ। কিন্তু বিদ্রোহ করে কিছু পাওয়া যায় না। বরং মূল্য দিতে হয়। শূন্য আস্ফালন করে, মানুষকে ভড়কে দিয়ে, মেকী আদর্শের ভাবমূর্তিকে কিছুদিন ধরেও রাখা যায়, কিন্তু বালির তৈরি ইমারতের মতো একদিন

ভেঙে পড়ে, হুড়মুড় করে। সেদিন মানুষের ক্ষমা, করুণাও পাবে না তুমি। এমন অসম্মান নিয়ে শূন্য, নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে যাওয়ার কোনো মানে আছে? পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করতে পারে শুধু সৎ, পরিশ্রমী, বিবেকবান চরিত্রবান মানুষ। সেই চরিত্র তোমার মধ্যে কোথায়? তোমাকে তো আদর্শভ্রষ্ট, ব্রতভ্রষ্ট, ভীরু মানুষ মনে হচ্ছে। তোমার মতন লোভী, আত্মসুখী মানুষ আমার সখা, আমার আদর্শের মশালচি ভাবতেও লজ্জা করছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। ছিঃ! তোমার ক্লীবত্ব দেখে লজ্জায় মাথা হেঁটে হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণের কথাগুলো একটুও মিথ্যে নয়। ঠিকই বলছে। কিন্তু সে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অন্য কথা ভাবল। বলল : সখা, তোমার মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই। আমরা কিছুই হারাই না। হারিয়েই তো মানুষকে পেতে হয়। এক হারানো আর এক হারানোর পাওয়ায় ঘর ভরে তোলে। কে জানে জীবনের সবচেয়ে বড় হারিয়ে যাওয়া জিনিসকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো বিধাতা যুদ্ধের আগে আমায় এ রণক্ষেত্রে টেনে এনেছে। নইলে যে কথা আগে কখনো মনে হয়নি তা এত গভীর করে মনকে নাড়া দেবে কেন? সখা, এখন আমার যে কাজটাকে ভুল বলছ, কাল সেই বড় ভুলটাকে মনে হতে পারে এর মতো হিতকর কিছু হয় না। এখানে এসে মনে হচ্ছে, ভুল শোধরানোর জন্য ঈশ্বর আমাকে এবং তোমাকে এখানে এনেছে। রণক্ষেত্রের বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনকে গভীর করে অনুভব করা যায়। আশ্চর্য! আমার চিরচেনা মনটাকেই অচেনা লাগছে! আমাদের কোনো চেনা এবং জানা বোধ হয় অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ প্রতিদিন বদলে যায়। হয়তো এমন না হলে মানুষের জীবনটা পশুর মতো এক নিশ্চল বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকত।

কৃষ্ণ হতবাক। ভেতবের দুরন্ত অস্থিরতাকে চাপা দেওয়ার

জন্য বলল : নিজের ভয়, দুর্বলতাকে আড়াল করার চমৎকার যুক্তি। নিজের সঙ্গে ছলনা করাও পাপ।

অর্জুন বেশ একটু অধৈর্য হয়ে বলল : ছলনা করব কেন? প্রত্যেক মানুষের নিজের কিছু কর্তব্য থাকে। সেটা করা যেমন ধর্ম, না করাও তেমন অধর্ম। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধ না করা তার অপরাধ। তার স্বধর্মচ্যুত হওয়া। কিন্তু ক্ষত্রিয়ও তো রক্তমাংসের মানুষ। সব মানুষই দুঃখ, কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করে যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের এত বড় ইচ্ছেকে ক্ষাত্রগর্বের অহঙ্কারে তুচ্ছ করি কেমন করে? সখা একজন মানুষ হিসেবে আমার তো সম্মানীয় মাননীয় গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখানো কর্তব্য। সেটা না করা অপরাধ। একজন মানুষের এসব দুর্বলতা থাকতেই পারে। সেটা কোনো দোষের নয়। তবু আমাকে তুমি অভিযুক্ত করছ।

কৃষ্ণ বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : চমৎকার যুক্তি। তোমাকে কি করে বোঝাই? নিজের সম্পর্কে তোমার বড় অহঙ্কার। নিজেকে তাই তুমি এ যুদ্ধের কর্তা ভাবছ। কর্তৃত্বের এই অভিমান তোমাকে অহঙ্কারী করেছে। তোমার কথাবার্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করছে। আমার মনেও সংশয়। আমার সামনে যে বসে আছে সে কি কৃষ্ণ সখা অর্জুন! চিনতে সত্যি আমার ভুল হচ্ছে। তোমার দম্ভ, আমিত্ব-গর্ব, কর্তৃত্বের অভিমান দুর্যোধনের মতো বিশ্বসংহারী বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে যুদ্ধের যে ডঙ্কা বাজছে, তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে তুমি বিশ্বের কোন মঙ্গল সাধন করবে? নিজের জেদে জিতবার জন্যে তোমার "কর্ণ" কোনো ভালো কথা কিংবা সুপরামর্শ শুনছে না—কি হবে ঐ কু-কর্ণের? তোমার মনও তোমার বশে নেই, কোনো শাসন মানছে না বলে দুঃশাসনের মতো বাক্যে অসংযত তুমি। এই মন তোমার কোন কাজে লাগবে? যে তোমার চারিত্রিক পতনের কারণ তাকে সমূলে

ধ্বংস কর। তোমার চক্ষু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো। তাই আলো-অন্ধকার টের পাও না। তোমার দৃষ্টি শকুনির মতো নিম্নাভিমুখী। এসব কু-প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত কর। তামসিকতায় তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলেই বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। জ্ঞানের আলোয় আভাসিত না হলে তার অন্ধকার দূর হয় না।

কৃষ্ণের কথা শুনতে ভালো লাগছিল অর্জুনের। মুগ্ধ চোখে চেয়ে কৃষ্ণকে বলল : সখা স্বার্থের এত সংঘাত কোনো মানুষের কোনো উপকারে আসবে না। শুধু বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে ব্যক্তির মনের সুখ ও শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে জীবন থেকে। এই যুদ্ধ মানুষের বিবেককে নষ্ট করে দেবে। মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই এ জীবনকে বিষময় করে দেবে। যে প্রয়োজনে মানুষ একদিন সমাজ গড়েছিল, আদর্শ, আনুগত্য, বিশ্বাসের মূল্যবোধগুলি গড়ে তুলেছিল তার সব কিছু যুদ্ধে ধ্বংস হবে। আবার জঙ্গলের জীবন শুরু হবে। এই রণাঙ্গনে দাঁড়িয়েই সেই বৃহৎ সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধ জীবনকে কিছু দিতে পারে না। শুধু নব নব দুঃখ দেয়। যন্ত্রণা দেয়। তাই তো যুদ্ধে আমার মন সায় দেয় না। তুমি কি ভাবছ, অন্যেরা কি ভাবল তা নিয়ে আমি ভাবি না আমি? কিন্তু তুমি বার বার আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছে।

এড়িয়ে যাইনি। তুমি মায়ার পিছনে দৌড়িয়ে নিজেকে শুধু বিভ্রান্ত করছ। আমি সখা হয়ে তোমাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছি। যাঁদের পরম স্নেহের কথা ভেবে তুমি বিব্রত তাঁদের সম্পর্কে আমার কথা শুনলে হয়তো তুমি অবাক হবে। তোমার প্রজ্ঞারূপী পিতামহ ভীষ্ম তোমার মৃত্যুবাণে শাণ দিচ্ছেন। বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর মনে কোনো যন্ত্রণা নেই। ধীশক্তিরূপী আচার্য দ্রোণও মমতা ত্যাগ করে দুর্যোধনেব পক্ষে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে শর তুলে ধরেছেন। তবু মোহবশত এঁদেরই প্রিয়জন বলে ভাবছ।

আসলে এঁরা সকলে তোমার হিতৈষী হয়েও পরম শত্রু। শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে তাঁরা যদি তোমাকে বিদ্ধ করতে পারেন, তুমি কেন অস্ত্রাঘাত করবে না তাঁদের উপর? এ রণক্ষেত্র। বন্ধু, আত্মীয় বলে কেউ এখানে নেই। নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকাই ধর্ম। আমার সকল সময়ের সাথী বন্ধুরূপী ভ্রাতা অগ্রজ বলরাম যুদ্ধকালে আমাকে ত্যাগ করে ব্যথিত করল। এই প্রথম আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম। তবু শোকে, দুঃখে কাতর হয়ে আমি কর্তব্যভ্রষ্ট হইনি। তা হলে কৃষ্ণসখা পার্থ ধর্মভ্রষ্ট হবে কেন? যাদের কথা ভেবে হৃদয় কাতর হচ্ছে তারা তো আগেই মরে গেছে। বিবেকের মৃত্যুও মৃত্যু। কাজেই তাদের কথা ভেবে আকুল হওয়া নিরর্থক।

কৃষ্ণের কথাগুলো অর্জুন কি বুঝল—অর্জুনই জানে। ফ্যাল ফ্যাল করে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকল। হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বলল : লোক ঠকানো ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর মানুষ আমি নই। আমার মধ্যে যে অনেকগুলো মানুষ বাস করে আমি জানতাম না। কোন মানুষটা কোন সময়ে মনের উপর দখল নেয়, কর্তৃত্ব করে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা আমার নেই। নিজেকে নিয়ে আমি যে কী করি? নিজেকে পাহারা দেওয়া, ঠিক মতো চালানো সবচেয়ে কঠিন কাজ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমার আমিটাকে চিনতে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেললাম। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। কর্তব্য অকর্তব্য স্থির করার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। যা করলে ভালো হয় তুমিই কর। চিরদিন তুমি আমার ভালো চেয়েছ, ভালো করেছ—যা কিছু সুন্দর তা তো তুমিই চিনিয়েছ আমাকে। যা করতে চেয়েছি তুমিই করেছ। নিজের ইচ্ছেতে কোনোদিন কিছু করা হলো না। আমার অদৃষ্টই আমাকে টেনে নিয়ে গেল। তুমি আমার জীবন, আমি শুধু নিমিত্ত।

আসলে, আমি কিছুই করি না। আমি যা নিজে করি বলে ভাবি, তা তো তুমিই আমাকে দিয়ে করাচ্ছ। তবু আমিত্বের অহংকার করি। জীবনের এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে অনুভব করতে পারছি, তুমিই ইহকাল, পরকাল। তুমি ছাড়া কি আছে আমার। সখা, এখন যা করলে ভালো হয় তুমিই কর। আমি তোমার শরণাগত! আমাকে তোমার মতো করে গড়ে নাও।

অর্জুনের দু'চোখে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ মাখানো এক আশ্চর্য-সমর্পণ-তন্ময়তা তাকে অপরূপ শ্রী দিল। আলাদা তার দ্যুতি। অর্জুনের আকস্মিক ভাবান্তরে কৃষ্ণ বেশ একটু আশ্চর্য হলো। খুশির ঢেউ বয়ে গেল তার বুকের ভেতর। অফুরন্ত আনন্দের রহস্যের সিঁড়ি বেয়ে সে অর্জুনের কথার রহস্যের গভীরে পৌঁছতে চেষ্টা করল। নিজের মনেই বলল : সখা, মথুরার কৃষ্ণ বাঁশির সুরে হৃদয় গলানো ভালোবাসার সুর ভরে দিয়ে, মমতার মাধুরী মিশিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তাকে হৃদয়ের খুব কাছে টেনেছিল। কিন্তু ওভাবে মানুষের ভালো করা যাবে না। দিন বদলেছে। প্রাচীন মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শ, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর মানুষের আর আস্থা নেই। অবক্ষয়ে সব ক্ষয় হচ্ছে। মূল্যবোধের মূলটুকুও মনের মাটিতে নেই। মনুষ্যত্ব, মানবিকতার পাত্রও শূন্য আজ। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চক্রও ধরতে পারি।

সখা, তুমি যুদ্ধ করবে!

যুদ্ধ তো প্রতিনিয়ত করছি। এ লড়াই তো চোখে দেখা যায় না! মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের শেষ নেই। সত্য, ধর্ম ও ন্যায়ের জন্যে বাঁচার জন্যে প্রতিমুহূর্ত ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধের শক্তি প্রার্থনা করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তারই ফলশ্রুতি। ধ্বংসকারী শক্তির প্রতিনিধি দুর্যোধনকে ধ্বংস করেই মানুষের বাসযোগ্য করতে হবে এ ধরাতলকে। রক্তে স্নান করে

ধরিত্রী শুচি হবে। তাই ব্রজের কৃষ্ণকে আর দরকার নেই। পার্থসারথির কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খে বাজবে তার অভিষেকের আগমনী। তাই তো এ মহারণে সারথি আমি, রথী তুমি।

কৃষ্ণের কথা অর্জুন শুনেছিল কি না বোঝা গেল না। তার শান্ত, নিস্পন্দ দুটি চোখ সুদূরের দিকে পাতা। পাণ্ডব শিবিরের দিকে একখানা রথ অগ্রহায়ণের মিঠে রোদ গায়ে মেখে কৌরব শিবিরের দিকে ধেয়ে গেল। পাণ্ডবদের যুদ্ধের সীমারেখায় গিয়ে থামল। রণসজ্জা খুলে রেখে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে এল। নগ্ন পায়ে তাকে কৌরবপক্ষের সীমানায় প্রবেশ করতে দেখল। ভীম এবং নকুল জ্যেষ্ঠের অনুগমন করল। দেহরক্ষীর মতো চারদিক নজর রেখে তার দু'পাশ আগলে আগলে যাচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরকে নির্ভয়ে এবং অসঙ্কোচে ভীষ্মের কাছে যেতে দেখল। এভাবে যুধিষ্ঠিরকে হঠাৎ আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যেরা অবাক হলো। পিতামহ ভীষ্মও বিস্মিত হলেন। অগ্রজকে এভাবে কৌরবপক্ষের সৈন্যদের ভেতর দেখে অর্জুনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। যুদ্ধের ব্রাহ্মমুহূর্তে তবে কি অগ্রজ নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল? যুদ্ধের কোনো পক্ষের লাভ হবে না—শুধু শুধু লোকনাশ, কুলনাশ, আত্মীয়বধ হবে। তাই কি যুধিষ্ঠির স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পিতামহের শরণাপন্ন হয়েছে? সংশয়ে, সন্দেহে, অর্জুনের মনটা দুলতে লাগল। একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের ভেতর কৃষ্ণ তার মনের প্রতিক্রিয়াটা টের পেল।

অর্জুনের মন পুনরায় বিষাদে ভরে যাওয়ার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ নিজের মনে বলল : অর্জুন, মনের অনেক কুঠরীর মধ্যে আলাদা আলাদা করে বাস করে আমিত্ব, অহঙ্কার, গর্ব, সংশয়, অবিশ্বাস, মোহ ও মায়া—এদের মতো আত্মীয়রূপী শত্রু হয় না। মনের ঘর থেকে এদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত সঙ্কল্প কর্মে

ব্রতী হওয়া যায় না। তোমাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়েছি, উদ্বুদ্ধ করেছি। তবু তোমার সংশয় কাটছে না। আশ্চর্য মানুষ বটে! নিজেকে তুমি কর্তা ভাবলে ভুল করবে। কর্তা ঈশ্বর। আত্মাকে যেমন দেখা যায় না, তেমনি ঈশ্বরকেও চোখে দেখা যায় না। তাঁকে স্পর্শ করাও যায় না। অথচ, আত্মা যেমন শরীরের মধ্যে আছে, তিনিও আছেন সব কিছুর ভেতরে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষ্যে—কোথায় না আছেন তিনি? আত্মা ও ঈশ্বরে স্বরূপত তফাত নেই। মনের ইচ্ছায় যেমন দেহ কাজ করে তেমনি এই বিশ্ব চলছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তোমার সব কাজের কর্তা ঈশ্বর। সেই অনুভূতিটাই সব—সোহং ; আমিই সে। মানুষের মধ্যেই তার প্রকাশ।

আচমকা একটা অনুভূতি হলো অর্জুনের। চকিতে ফিরে তাকাল কৃষ্ণের দিকে। সেই সময় নীল আকাশের বুক চিরে এক ঝাঁক পাখি হেমন্তের মিঠে রোদ গায়ে মেখে মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে উড়ে গেল দিগন্তের ওপারে। কিন্তু আকাশের বুকে কোন দাগ থাকল না। ওদের গতিময় যাত্রার দিকে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল : সখা, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আমরা সমস্যা মোটেই লঘু কিংবা সরল নয়। তোমার সব কথা ভালো করে বুঝতে পারি না। তবে, এটা বুঝি যে, একজন অনিচ্ছুক মানুষকে উদ্দীপিত করে তাকে অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে আনার জন্যে তুমি অনেক কিছু করছ। তবু মনেতে আমার অনেক জিজ্ঞাসা। কর্তব্যবিমুখ, দায়িত্বহীন, বিশ্বাসঘাতক আত্মদ্রোহী বলে আমাকে তিরস্কার করছ, কিন্তু এ ভর্ৎসনা কি আমার প্রাপ্য? আমি তো কিছুই করছি না। ঈশ্বর করছে! পরম করুণাময় ভগবানের একান্ত ইচ্ছেটা যুদ্ধে আমার অনীহা হয়ে যে প্রকাশ পাচ্ছে না, একথাটা জোর করে অস্বীকার করা যায় কি? ঈশ্বরের অব্যক্ত অভিপ্রায় তো মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ

যুদ্ধের রথী বলেই হয়তো আমাকে নিরাসক্ত করে, নিস্পৃহ রেখে মহাযুদ্ধের উপর যবনিকা টেনে দিচ্ছেন। নইলে, যুদ্ধের আগের আমি, আর এখনকার আমি এক নই কেন? আমাকে দিয়ে তাঁর এই নাটক করার কী দরকার ছিল?

অর্জুনের কথা কৃষ্ণকে বেশ একটু অবাক করল। গম্ভীর মুখে বলল : সখা, জ্ঞানীর মতো কথা বলছ তুমি। কিন্তু জ্ঞানীরা শোক দুঃখে অধীর হন না। নিজের অক্ষমতার কোনো কৈফিয়ত খোঁজেন না। নিরাবেগ চিত্তে, নির্বিকারভাবে সুখে দুঃখে, বেদনায়-বিক্ষোভে অবিচলিত থাকেন। কিন্তু তুমি বিভ্রান্ত, বিচলিত। তমোগুণে আচ্ছন্ন। গুহাবাসী, মনটা তোমার অন্ধকার গুহা থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে। খোলা আকাশের আলো চোখে সহ্য হচ্ছে না বলে তার পুরনো জায়গা আঁকড়ে আছে। কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বিরাট আকাশকে কি দেখতে পাওয়া যায়? চারপাশের বিরাট জগতের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকেই তখন বড় দীন এবং ক্ষুদ্র মনে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটা জগৎ তৈরি করে নিয়ে কুয়োর ব্যাঙের মতো নিজেকে স্বরাট হিসেবে দেখতে চায়। তাই যুদ্ধের প্রতিপক্ষের ভেতর যাঁরা অত্যন্ত প্রিয়জন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে তো ক্ষুদ্র মানসকেন্দ্রিক জগতের জিনিস। বিরাটের বিরাট পরিবেশে তার কোনো মূল্য নেই। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের যে অবিরাম প্রকাশ ঘটছে আমরা তার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। একটা অংশ গেলেও—প্রায় অবিনাশী ক্রীড়া করেই চলে। তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। যে প্রদীপ শিখা স্থির হয়ে জ্বলছে তাকে একটি প্রদীপ শিখা বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে প্রতি নিমেষেই শিখাটি পুড়ে নতুন একটা শিখা জন্ম নিচ্ছে ; কিন্তু ক্ষয় ও পূরণ এত দ্রুত ঘটছে যে আমাদের চোখ তা ধরতে পারছে না। ক্ষয় ও পূরণ প্রকৃতিরই নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারে ক্ষয় ও পূরণের মাধ্যমে

প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষা করছে। সেই অনন্ত প্রবাহের মধ্যে একটি মানুষ ও অনেকগুলি মানুষের সমষ্টি মাত্র। এই পরম সত্যটি যে জানে না সে কেবল দৈহিক মৃত্যুর কথা ভেবে বিষণ্ণ হয় ; সে জ্ঞানবান নয়। তাই বলছি, তুমি কাউকেই হত্যাও করছ না, কেউ নিহত হয়ও না, অস্ত্রের দ্বারা কাউকে মারাও যায় না। তুমিও সেই বিরাট মানসের একটা বুদ্বুদ। তুমি শুধু উপলক্ষ। যা করবার সেই বিরাট করে রেখেছে—তোমার মনের প্রকাশের ভেতর তাঁর সেই ক্ষুদ্র ক্রীড়াকে প্রত্যক্ষ করছ। বিরাটের সঙ্গে তোমার একাত্মতা কোনো কালে ঘটেনি বলেই পরম সত্যকে জানা। একটি মৃত্যু কিংবা অনেক মৃত্যু কোনো ঘটনাই নয়।

হঠাৎ অর্জুনের গাঢ় গভীর দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দে কৃষ্ণ বেশ একটু অবাক হয়ে থেমে গেল। সপ্রশ্নদৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকাল। কয়েকটা মুহূর্ত অর্জুন থম ধরে বসে রইল। তারপরে বেশ একটু মজা করেই অর্জুন বলল : দিলে তো সব গণ্ডগোল করে। হত্যা করছি, নিহত হচ্ছে না ; এরকম উদ্ভট কথা শুনিনি।

অর্জুনের রসিকতায় কৃষ্ণ হাসল। বলল : তুমি চিরকালই একটু কেমন যেন। না দার্শনিক, না জ্ঞানী। এরকম কেন বল তো?

অবিশ্বাসভরা চোখে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে অর্জুন বলল : কে জানে? একজন মানুষের বুকে কত ধরনের উত্তরহীন প্রশ্ন মাথাকুটে মরে, মানুষ যদি তার সব জবাব পেত তাহলে কোনো কষ্টই থাকতো না তার। আমার বিবেক বুদ্ধি সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে। দোটানার যন্ত্রণায় আমি কষ্ট পাচ্ছি।

কিসের দোটানা?

একদিকে অস্তিত্ব অন্যদিকে ধ্বংস—দুদিকেই সমান টান। তোমার কথায় চুম্বক আকর্ষণ যেমন টানছে আমার জাগ্রত বিবেকের প্রশ্নগুলো তেমনি আমায় অশান্ত করছে।

তুমি মরতে ভয় পাও? হঠাৎ এরকম প্রশ্নের মানে কি?

প্রশ্ন করবে না।

মরতে কেউ চায় না। কিন্তু চাইলেই কি হয়? তাই, মরার মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

বোঝা গেল না।

গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লে উভয়কেই ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

অর্জুন, মনে করলেই যন্ত্রণা, নইলে কিছুই নেই।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল অর্জুনের। মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। কথা খেলছে না মস্তিষ্কে।

কৃষ্ণ অপলক অর্জুনের দিকে চেয়ে বলল : অর্জুন পৃথিবীতে অন্যায়, বঞ্চনা চিরদিন আছে, কিন্তু তাকে সহ্য করারও একটা সীমা থাকে। সেই সীমা অতিক্রম করলে বিপর্যয় বাধে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উৎস তো তাই। মানুষের সামনে তার চিত্রটা তুলে ধরার জন্য বিরাট পুরুষের এই নাটক। এ হলো লোকশিক্ষার জন্য! বিরাট শবরূপী শিবের মতো প্রচ্ছন্ন থেকে একদিন অসহিষ্ণু হয়ে রুদ্ররূপে জেগে ওঠেন। লোকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে সেই শিক্ষাটা নেবে। মানুষের পাপে, অধর্মে, স্বার্থে, রোষে, হিংসায় কুরুক্ষেত্রে যে আগুন জ্বলে উঠল তার জন্যে মানুষ দায়ী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তো সাধারণ যুদ্ধ নয়, একটা বিরাট যুদ্ধ। তার জন্য সময়ের দরকার। সব কিছুর জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। নির্ধারিত সময়ের আগে কিছুই হয় না। সময়ের সেই চরম মুহূর্তটি কিন্তু কালই ঠিক করে রাখে। মানুষ চেষ্টা করেও তাকে আগিয়ে দিতে পারে না। পারলে, লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই যুদ্ধ অনেক আগেই হতে পারতো। পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা, অপমান এই যুদ্ধের অনেকগুলি কারণের একটা কারণ মাত্র। অন্য কারণগুলির সমন্বয় যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই যুদ্ধ বাধেনি। বিশেষ বিশেষ

ঋতুতে যে ফুল ফোটে, ফল হয়—তা কি অন্য এক ঋতুতে হয়, না করা যায়? যা করার অবাঙ্‌মনস্‌গোচর সেই শক্তিই করছেন। মানুষ তাঁর উপলক্ষ এবং যন্ত্র। যা করবার তিনি কালতরঙ্গের ভেতরেই করে রেখেছেন—তুমি, দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির দুর্যোধন এবং শকুনি তার উপলক্ষ। তাই বলছিলাম, তোমার এই সব প্রশ্ন কিংবা কৌতূহলের কোনো দাম নেই। তবু মোহ এবং অজ্ঞানবশত মানুষ নিরন্তর নিজেকে প্রশ্ন করে থাকে। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত নিয়ে আমরা কঠিনভাবে বিচার করি। দুর্বলতা, মায়া-মমতাকে প্রশ্রয় দিই। আসলে মনের আঁধার না কাটা পর্যন্ত অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তুমিও করছ।



অন্ধকারের ভিতর থেকে অর্জুনের চোখের সামনে তেরো বছর আগের একটা ছবি ফুটে উঠল। দ্যূতক্রীড়ায় সব হারিয়ে যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীসহ অন্য ভাইদের সঙ্গে একত্রে কাম্যকবনে বাস করছে। বিষাদে, মর্মবেদনায়, আঘাতে, যন্ত্রণায়, অপমানে, আত্মগ্লানিতে তারা কেউ তখন সুস্থ নয়, স্বাভাবিকও নয়। তাদের সব রাগ যুধিষ্ঠিরের ওপর। দুরন্ত আক্ষেপে মাথার মধ্যে শিরা উপশিরাগুলো দপ্ দপ্ করে। চোখেতেও একটা দিশেহারা ভাব। দিন-রাত যেন কাটতে চায় না।

যুধিষ্ঠির অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে। অপরাধীর মতো একা একা থাকে। অপ্রিয়-সত্যের আক্রমণ গ্রহণ করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে। অপ্রিয় সত্যের আঘাত তো অসহনীয়। প্রতিদিনই অপেক্ষা করে একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু পাঞ্চালী এবং ভাইদের ক্ষমা সহিষ্ণুতা, করুণা তার ভেতরটা অস্থির করে তোলে। অপরাধবোধে কেমন একটা পাগল পাগল ভাব তার। সেই দৃশ্যটা তার বুকে স্মৃতির দীপ হয়ে জ্বলছে। তার অনুতাপিত কণ্ঠস্বর অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মনের অভ্যন্তরে। চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে দৃশ্য।

কাম্যকবনে কৃষ্ণ এসেছে। কৃষ্ণ কোনো প্রশ্ন করার আগেই যুধিষ্ঠির বিপন্ন মুখে বলল : কেন এমন একটা ঘটনা ঘটল? কী ভীষণ অন্যায় করেছি? ভাইদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছি। আমার লোভে, পাপে ভাইদের এই দুরবস্থা কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের সহসা আত্মবিস্মৃতি ঘটল। এক প্রবল সহানুভূতিবোধে সে সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে এল। ভেতরকার রাগে মুখ তাম্রাভ হলো। চোখ দুটো হিংস্র-আক্রোশে জ্বল জ্বল করতে লাগল। বলল : ধর্মরাজ, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যারা তোমার সর্বস্ব হরণ করল, আমার আত্মীয় হলেও তাদের কোনো ক্ষমা করব না। তোমার রাজ্য তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেব। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আর কালক্ষয় না করে আমরা হস্তিনাপুর আক্রমণ করব।

কৃষ্ণের ক্রুদ্ধমূর্তি যুধিষ্ঠিরকে ভীত করল। একটা কিছু ঘটার আশঙ্কায় তার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। বলল : বাসুদেব, আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিজ্ঞা আমাকে রাখতে হবে। তা-না-হলে ধর্মের কাছে, সত্যের কাছে, বিবেকের কাছে আমি অপরাধী হবো। কৈফিয়ত দেবার কিছু থাকবে না। তোমরা আমাকে শ্রদ্ধা না করতে পার, কিন্তু অপমান কর না।

ভীম বেশ একটু বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে বলল : কিসের প্রতিজ্ঞা? যুদ্ধ করব না বলে তো কোনো অঙ্গীকার করনি। তা-হলে যুদ্ধ করে নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করতে অপরাধ কোথায়? আশ্চর্য তোমার অপমান জ্ঞান! এতই যখন অপমান জ্ঞান, প্রতিজ্ঞা করার সময় ভাইদেরও যে অসম্মান হতে পারে সে কথাটা ভাবনি কেন? ছোট বলেই, যা খুশি আমাদের নিয়ে করবে? আমাদের এবং পাঞ্চালীকে অপমান করার অধিকার তোমাকে কে দিল?

মধ্যম, তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। তবু ধর্ম সবার ঊর্ধ্বে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লে আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তেমনি যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম কেশর ফোলা সিংহের মতো রাগে গর্‌গর্‌ করে উঠল। বলল : মাথায় থাকুন ধর্ম! ধর্ম? ধর্ম আমাদের কী দিয়েছে? ধর্ম এক নয়, ধর্মের অনেক রূপ, অনেক অর্থ। সবার ধর্ম সমান নয়। দেশ-কাল-পাত্র-অবস্থাভেদে ধর্মের বিভিন্ন অর্থ। ধর্ম সম্পর্কে এক একজনের উপলব্ধিও এক এক রকম। দ্যূতসভায় পণবদ্ধ দ্রৌপদীর আকুল আর্তিময় প্রশ্ন শুনেও কুরুবৃদ্ধেরা নীরব। তুমি নিজেও নিরুত্তর। ধর্মের রক্ষাকবচে বাঁধা মহামতি ভীষ্মও দ্রৌপদীর আকুল সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেয়নি। ধর্মপ্রাণ বিদুরও দ্রৌপদীর প্রশ্নের কোনো সদর্থক জবাব দিতে পারেনি। কেন? কারণ ধর্মের অর্থ ও তাৎপর্য অনির্ণেয়। তাহলে বোঝ, ধর্ম কতবড় ধোঁকা। সংকটকালে কত অনির্ভরযোগ্য। ধর্মই পারে বিপরীত আচরণকে সমর্থন করতে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ। কৃষ্ণ ঠিক বলেছে, রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। বনবাস ক্ষত্রিয়ের লজ্জা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলপ্রয়োগ করা, তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করা। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে নাও অগ্রজ। কৃষ্ণ আমাদের বন্ধু। তার ও দ্রুপদরাজের সহায়তা পেলে এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব। কালক্ষয় না করে কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হোক। তাতে আমাদের সম্মান বাড়বে। অপমানের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব।

যুধিষ্ঠির তবু নিস্পৃহভাবেই বলল : প্রতিজ্ঞা লঙঘন সম্ভব নয়।

অর্জুনও বলল : মধ্যম, তোমার মতো আমার বুকেও ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। কিন্তু রাগে জ্বলে ওঠার সময় নয় এখন। আমাদের সম্বল কী আছে? কেন বোঝ না সূর্যের ধার করা আলো যেমন চাঁদের কলঙ্ক তেমনি রাজ্যশাসনে পরনির্ভরশীল হওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুতে নেই। আচার্য দ্রোণ বলতেন, বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। রাজার সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কোনো বন্ধুত্ব

হয় না। দয়ায়, করুণায়, ভিক্ষায় বন্ধুত্ব নোংরা হয়ে যায়। শুধু স্বার্থের জন্যে, রাগের বশে সখাকে রাজ্যপুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনে তার সর্বভারতীয় উজ্জ্বল ভাবমূর্তির গায়ে কলঙ্ক লাগতে দেওয়া আমাদের উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রাণ হয়ে সেই অপবাদ, কুৎসা আমরা সইব কেমন করে? প্রীতিবশে সখা পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যজনিত মর্মপীড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে মুহূর্তের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে যদি অসংলগ্ন কথা বলেই থাকে, তার সেই ভুলের সুযোগ নেওয়া বন্ধুর কাজ নয়। সকলের কাছে পাণ্ডবসখাকে ছোট করে দিতে পারি না। তার চেয়ে জ্যেষ্ঠের কথামতো কাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কাল তো থেমে নেই। দেখতে দেখতে একদিন শেষ হয়ে যাবে তার প্রতীক্ষাও।

কৃষ্ণ অর্জুনের বাক্যে আশ্চর্য হয়ে গেল। মুগ্ধ দুটি চোখ তার চোখের উপর পেতে রেখে বলল : সত্যি তুমি আমাকে কত ভালোবাস। আমার প্রাণের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু তুমি। তোমাকে আমার কোনোদিন চেনা শেষ হবে না।

ভীমের ভুরু কুঁচকে গেল। রাগে শরীরের ভেতর রি-রি করতে লাগল। বলল : ক্লীবের মতো কথা বলছ তোমরা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, দুঃসহ দুঃখের কাল এক অহোরাত্রই এক বছরের সমান বলে বিবেচিত হয়। তা হলে, তেরো দিনে তেরো বছর পূর্ণ হয়েছে ভাবতে অসুবিধে কোথায়?

কাছেই দাঁড়িয়েছিল দ্রৌপদী। নিরুপায় ক্ষোভে সহসা জ্বলে উঠল তার ভেতরটা। বলল : কেশব, তুমিও শেষে প্রিয়সখিকে ভুলে গেলে? আমার অদৃষ্টটাই মন্দ। তেরো বছর ধরে আমার নারীত্বের অপমান, অসম্মান বুকে করে বেড়ানোর কষ্ট, যন্ত্রণা যে কী ভয়ানক, তুমি জানবে কেমন করে? তুমি তো আর মেয়ে নও? প্রিয় সখির দুঃখের জন্যে তোমার দরদ, সহানুভূতি কোথায়

গেল সখা?

কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাকিয়ে আছে দ্রৌপদীর দিকে। কী অনিন্দ্যসুন্দর দ্যুতি বেরোচ্ছে তার চাহনি দিয়ে। বলল : সখি, আমরা কিছুই করি না। আমার ইচ্ছেরও কোনো দাম নেই। যুদ্ধ করতে চাইলেও যে যুদ্ধ হয় না তাও তো দেখলে। নির্ধারিত সময়ের আগে কোনো কাজই হয় না। কাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সকলকে প্রতীক্ষা করতে হয়। আমরা সকলে কালের অধীন। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য কালচক্রে ঘোরে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী নয়। সে শুধু উপলক্ষ। কালের পুতুল তুমিও। তোমার অপমান সেও কালের সৃষ্টি। কাল শুধু আকর্ষণ করে। পাণ্ডবেরা রাজা থেকে সাধারণ মানুষের সমতলে যে নেমে এলো সেও কালের খেয়ালে।

দ্রৌপদী সরোষে চিৎকার করে বলল : তোমার কালের কীর্তন আমি শুনতে চাই না। সখা, ও সব নীতিকথা, ধর্ম কথায় আমার মন ভরবে না। কালের জন্যে দুঃখের রাত্রি যদি শেষ না হয়, ধর্মের জন্যে মানুষকে যদি ক্লীব হতে হয়, দরকার নেই আমার সে কথা শোনার। আমার আত্মীয়-বান্ধব কেউ নেই। এমন কি তুমিও না কেশব। নিজের কর্মের দ্বারা, উদ্যোগের দ্বারা শক্তির দ্বারা যে ফললাভ হয়,—আমার স্বামীদের ভেতর সেই পৌরুষ কোথায়? পৌরুষের অভাবেই দুবৃর্ত্তদের অন্যায় উৎপীড়ন, জুলুম, দৌরাত্ম্য শুধু বেড়ে যায়। ধর্ম আর কালের কথা বলে তোমরা প্রশ্রয় দিচ্ছ তাকে। অথচ প্রজ্ঞারূপী ধর্মরাজের দুই বাহু ভীম ও অর্জুন, এবং জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মের সহায় কৃষ্ণ এই চারজনই পারে ত্রিভুবন জয় করতে। উৎপীড়ন বন্ধ করতে। তার জন্যে কালের অপেক্ষা করতে হয় না।

কৃষ্ণ দ্রৌপদীর কথায় রাগল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল, অর্থপূর্ণ হাসি। মধুর স্বরে বলল : প্রিয় সখি তোমার

চোখে প্রতিহিংসার আগুন। ও আগুন নিভবার নয়। ধরিত্রীরও সাধ্য নেই অত তাপ সহ্য করে। সখি, ও আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার জন্য নয়। আগ্নেয়গিরির গর্ভে শান্ত আগুন যেমন উদ্গীরণের অপেক্ষা করে তেমনি তুমিও না হয় কিছুকাল প্রতীক্ষা করলে—মানে, মর্যাদায় আদর্শে বড় হয়ে স্বামীদের সঙ্গে একত্রে স্বরাজ্যে ফেরার। সখি, আমি তোমার রাগের ভেতর মহাকালের পায়ে ঘুঙুরের শব্দ পাচ্ছি। তিনি নাচছেন তা তা থৈ থৈ।



একটার পর একটা ঘটনার ভেতর অর্জুন প্রবেশ করতে লাগল। কৃষ্ণের কথার ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যা তার মনকে গভীর করে স্পর্শ করে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত চোখ মেলে সে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। সম্মোহিত দৃষ্টি। হঠাৎ কৃষ্ণ প্রশ্ন করল : সখা কী ভাবছ এত।

কৃষ্ণের কথায় কী যেন হয়ে গেল অর্জুনের ভেতর। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হতাশ গলায় বলল : তাহলে এসব মায়া-মোহ, দুর্বলতা মানুষের মনে সৃষ্টি হলো কেন? সৃষ্টিকর্তার কাছে এসবের কোনো দাম না থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ দাম দেয়। আত্মজনকে পৃথিবীর মানুষ থেকে আলাদা করে চেনাল কে? মানুষই তো। সভ্য মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যখন আর পাঁচটা জীবজন্তুর মতো ঘুরে বেড়াত একা একা খাদ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সেদিন তো এসব প্রশ্ন ছিল না তার মনে। আত্মজন বলেও কেউ ছিল না তার। ঈশ্বর কে? বিরাট পুরুষ কে, কিছুই জানতো না। এমন কি মায়া-মমতা-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভক্তিরও দাম দিত না। মানুষ তার পিতৃপরিচয়ও জানতো না। জননী; কন্যা, ভগিনীবোধও ছিল না।

তার মনের বিবেকের কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু সেই অতীতটাকে আজ কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না। যুগযুগান্তরের মানুষ সম্পর্কে সঞ্চিত নিষেধের প্রভাবই আমাদের রক্তস্রোতে বইছে। কিন্তু আদিম লোভ-লালসা-হিংস্রতা, স্বার্থপরতা, অস্তিত্বের মরণপণ লড়াইয়ের এতটুকু অবসান হয়নি। পুরনো স্বভাবটা জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করে কেন নতুন হয়ে উঠতে পারলাম না? অবিনাশী আত্মার এ কোন অবক্ষয় বহন করে চলেছি? আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে তোমার সব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণ একটু ভেবেই বলল : দেখো অর্জুন, সত্যকে দেখার সাহস হয় তোমার নেই, না হলে জেনেও মিথ্যে বলছ।

সখা, এই তো তুমি রেগে গেলে। মানুষ যা পেয়েছে সেটুকুতে সন্তুষ্ট নয়, সে নিজেই স্রষ্টা। তাই জিজ্ঞাসা তার থেমে নেই। নিজেকে প্রশ্ন করে সে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে চলেছে। দুঃখকে আনন্দ করবার ভার তার হাতে। এর মধ্যে মিথ্যে কোথায় পেলে? আনন্দ আর দুঃখ যে মিলেমিশে যায় এটুকু আমি বুঝতে পারছি।

কৃষ্ণ আড়চোখে অর্জুনকে দেখল। অস্থিরতাকে সে যেন সামাল দিতে পারছিল না। তার ভিতরে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছিল। কৃষ্ণ টের পাচ্ছিল তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তার দিকে। কিন্তু কৃষ্ণ নির্বিকার। রথেতে পূর্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার দুটি চোখ কৌরব শিবিরের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে যুধিষ্ঠিরকে দেখছিল। ধর্মরাজ নিজেই তার নজর কেড়ে নিল। তীব্র হয়ে উঠল কৃষ্ণের চোখের দৃষ্টি।

ভীষ্মের খুব কাছাকাছি এসে যুধিষ্ঠির একবার পার্থসারথি কৃষ্ণের দিকে তাকাল। রোদে ঝলমল করছে প্রান্তর। সেই

বিশালতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করেই কৌরব শিবিরে গেছে, কৃষ্ণ তার অভিব্যক্তিতে সেটা অনুভব করল। ভারতবর্ষের জন্যে তার কিছু করার আছে এই বোধটুকুই তাকে পিতামহের কাছে টেনে আনল। যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রণাম করল। পিতামহ তাকে আলিঙ্গন দিল। অনেকক্ষণ ধরে সে আলিঙ্গন চলল। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্যে আকাশে সাতটি গ্রহের সমাবেশ হয়েছিল। হঠাৎ শিহরিত হলো কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির তো ইচ্ছে করলেই এক অনতিক্রম্য দূরত্ব রচনা করতে পারত পিতামহের সঙ্গে। কিন্তু সে তা করল না। প্রয়োজনটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র তো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখানোর জায়গা নয়। তার জন্যে কারো মনে মান-অভিমান থাকাও ভালো নয়। তাই পিতামহকে যুধিষ্ঠির প্রণাম করে জানিয়ে দিল যে তাদের মধ্যে কলহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, পরস্পরকে দখলের চেষ্টাও নেই, তবু শত্রুরূপে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার আগে সেটা যে হারাতে যাচ্ছে এবং সেজন্য নিজেদেরও হারিয়ে যাওয়া দরকার, জীবনের সংকট সময়ে সেকথাটা হৃদয় নিঙড়ে বোঝাটাও এক জরুরী ব্যাপার। একথাটা শুধু ভীষ্মকে নয়, আচার্য কৃপ ও দ্রোণকে প্রণাম করে তাঁদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠির সেই সত্যটা বোঝাল। অথচ কী আশ্চর্য এই নিস্পৃহতা তাকে চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়নি, যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের মধ্যেই ছিল।

দৃশ্যটা কৃষ্ণ স্বচক্ষে দর্শন করল। এক অজানা স্পন্দনে তার শরীর মন স্পন্দিত হতে লাগল অনেকক্ষণ। শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। ঠিক এরকম একটা মুহূর্তে অর্জুন প্রশ্নটা করল। কৃষ্ণ তার প্রসন্ন মুখখানা অর্জুনের চোখের উপর

তুলে ধরে বলল : তোমার মতো করে নয়, ধর্মরাজের মতো নির্বিকার, নিরাসক্ত মন নিয়ে জগৎকে দেখতে হবে। মানুষে মানুষে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রেম নেই, অধিকারবোধ নেই, আবেগ নেই, অথচ একটা সম্পর্ক আছে বিনিসুতোর মালার মতন ঝুলে। মানুষকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করার মতো মনুষ্যোচিত কিছু ব্যাপার থাকে। কিন্তু সে ভূমিকা কতো সংক্ষিপ্ত এবং নিরাসক্ত হলে মনে পরিতাপ থাকে না, বুকে দাগ কাটে না ধর্মরাজকে দেখে তোমার শেখা উচিত। যাদের জন্যে শোক করার কোন কারণ নেই তাদের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়া, কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অর্থহীন—প্রজ্ঞাবান ধর্মরাজ তা জানেন বলেই, আত্মীয় হত্যার চিন্তায় কখনো কাতর হননি। কিংবা শত্রুপক্ষের সেনা এবং সমর উপকরণের সংখ্যাতত্ত্ব বিচার করে হতাশও হয়ে পড়েননি। তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের ভেতর তিনিই সবচেয়ে নরম মনের মানুষ। অস্ত্রাঘাত তো দূরের কথা, একটা কঠিন কথা বললে পাছে কেউ আঘাত পায় তাই সে কথাও বলেন না। যুদ্ধে তাঁর ভীষণ ভয় বলেই আপস করে চলেন। তেরো বছর ধরে সত্যকে আঁকড়ে থাকতে তাঁর একটুও ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। তাঁর সহিষ্ণুতায় আমরাও অবাক হয়েছি। আসলে বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধ তাঁকে এই শক্তি দিয়েছে। তাঁর কোনো লোভ ছিল না। লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নিজেকে রাজনীতিক ভাবেন নি, ফলে এমন সহজ, স্বচ্ছন্দ। জীবন এবং পরিস্থিতি তাঁকে যখন যে কর্তব্যভার তুলে দিয়েছে তখন তা বহন করেছেন নির্বিকারভাবে—নিষ্ঠাবান সৈনিকের মতো। সেই কারণে এ মহারণে তিনি একটুও আড়ষ্ট নন, প্রাণহীন নন। সোজাসুজি সব কাজ করেন, একশো ভাগ সৎ থাকার চেষ্টা করেন। তাই নিজের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। তাঁর একটাই নীতি—সত্য ও ধর্মে অবিচল থেকে কর্তব্য করা। তাঁর

কর্তব্য ও আদর্শের সঙ্গে কর্মের কোনো বিরোধ নেই। পরিস্থিতি যখন যুদ্ধের আবর্তে টেনে নিয়ে এল তাঁকে তখনও বনবাসে থাকা কালে যে যুদ্ধ হতে পারত সে যুদ্ধ না করার জন্যে কোনো অনুশোচনা করতে দেখলাম না তাঁকে। এই সহিষ্ণুতা ও প্রতীক্ষারও একটা দরকার ছিল। একবারও মনে হয়নি, তিনি ভুল করেছেন। কারণ কি?

অর্জুন সহসা একটা অপরাধবোধ থেকে কথাগুলো বলল : সখা, তুমি এমনভাবে কথা বল যে, আমার মনে হতে থাকে তোমার কাছে আমি যেন কোনো অপরাধ করে ফেলেছি।

কৃষ্ণ প্রশান্ত গলায় মৃদু স্বরে বলল : তুমি ভুল বুঝ না। তোমার সঙ্গে ধর্মরাজের কোথায় এবং কত জায়গায় তফাত সেটা বোঝানোর জন্যেই এত কথা বলতে হলো। আমি তোমাকে কোনো নতুন কথা শোনাইনি। তুমিও জান, যে মানুষ জীবনে যুদ্ধ করতে চাননি। আপসে মিটমাট করতে চেয়েছেন—সে মানুষ রণক্ষেত্র পরিদর্শনে এসে আমূল বদলে গেলেন। তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই. একেবারে অন্য মানুষ। তাঁকে দেখে আমিও কম আশ্চর্য হইনি। একবারের জন্যে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগেনি, যুদ্ধ করে কী লাভ? তেরো বছর ধরে যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছেন, যুদ্ধে কি মীমাংসা হবে তার? যুদ্ধে কে জয়ী হবে—এপ্রশ্নও তাঁর নয়! সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কে কত বলের অধিকারী তার অঙ্ক কষে মন খারাপ করে বসে থাকেননি। বরং কী করলে যুদ্ধে নৈতিক এবং আত্মিক বল বাড়িয়ে তোলা যায়, আরো বেশি জয় আদায় করা যায় তার ভাবনায় বেশি সময় অতিবাহিত করছেন। তাঁর কর্মে চিন্তায় হতাশার কোনো চিহ্ন পড়েনি। এই মহারণে দুর্বল ভীরু মানুষটিই সবচেয়ে বেশি সাহসী এবং নির্ভীক। তোমার মতো ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ করেন না বলে কর্মে এত উৎসাহ। ফলের কথা ভাবলে কোন কাজই করা হতো না তাঁর।

প্রতিটি কাজের ফল সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে কাজ করতে চাইলে এক পাও অগ্রসর হতে পারতেন না। ফলের আকাঙক্ষা না করে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে কর্মের স্রোতে। কাজই বড়, ফলের আকাঙক্ষা নয়।

ভেতরে ভেতরে অর্জুনের মনে অনেক প্রশ্ন জমা হয়। দ্বিধা কাটিয়ে জিগ্যেস করতে তার একটু সময় লাগল। বলল : সখা, কর্মফলের প্রত্যাশা না করে কিভাবে কর্ম করা সম্ভব?

কৃষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে অর্জুনের অন্তরটাকে দেখল। বলল: ভৃত্যবৎ কর্ম করছি এই মন নিয়ে কর্ম করলে ফল লাভের কোনো আকাঙক্ষা থাকবে না। ভৃত্য প্রভুর আনন্দের জন্যে, তার সেবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে। প্রভুর দেওয়া কর্তব্য সম্পাদন করে। তার সেবায় ও কর্মে যে ফল লাভ হয় তার উপর ভৃত্যের কোনো অধিকার নেই। ভৃত্যও সেই কর্মফলের দাবি করে না। তার কর্মফল প্রভুকে অর্পণ করে। প্রভুর হিতার্থে করে। নিষ্কাম কর্ম করে বলেই লাভালাভ নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। কর্মফলের আকাঙক্ষা নেই বলে তাঁর সব কর্ম কামনাশূন্য এবং সঙ্কল্পবর্জিত। কর্মফলে আসক্তি নেই যার সে কর্ম করে পরিতৃপ্ত থাকে।

অর্জুন সহসা জবাব দিতে পারল না। কিন্তু তার যুক্তিবাদী মনটা ভেতরে ভেতরে তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল : সখা, বিচার করে দেখলে ভৃত্যের কর্মও নিঃস্বার্থ দানে পূর্ণ নয়। অর্থের বিনিময়ে সে সেবা ও পরিশ্রম বিক্রি করছে। বেঁচে থাকার জন্যেই সে কর্ম করছে।

কৃষ্ণ অর্জুনের বক্তব্যে চমৎকৃত হলো। অধরে কৌতুক হাসি। বলল : সখা, নিদ্রা যাওয়া একটা কর্ম। চুপ করে শুয়ে থাকাও একটা কর্ম। কিছু কামনা না করে বাসনাহীনভাবে কিছু করা হলো। একে নৈষ্কর্ম কেউ বলবে না। অনুরূপভাবে, চাষী পরিশ্রম

করে কঠিন মাটির বুকে যে ফসল ফলায় তার বেঁচে থাকার জন্য, তা কিন্তু ব্যক্তিগত চাহিদাকে ছাপিয়ে লোককল্যাণের দানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর কর্মে ব্যাপৃত বলেই নিজের প্রয়োজন ছাড়াও কর্ম করে। স্বার্থপরের মতো নিজের চাহিদার অতিরিক্ত কর্তব্য বা কর্ম যদি না করতো তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। তার উৎপাদিত ফসলের কতটুকুই বা সে পায়? সব ফসল তো মহাজনের সুদ গুনতে এবং জমিদারের প্রাপ্য মেটাতেই চলে যায়। তবু লাভের কথা, কিংবা পরিণামের কথা চিন্তা করে সে কর্ম ত্যাগ করে না। বর্ষার মুখ দেখলে কর্মের আনন্দে চিত্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কর্মফলের কোন প্রত্যাশা না করেই সে কর্তব্যের আহ্বানে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষ করে। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম করার এত বড় মহৎ দৃষ্টান্ত বোধ হয় মানুষের সমাজের আর নেই। ফসলের উপর, জমির উপর কর্তৃত্বের অভিমান ছেড়ে নিরাসক্তভাবে স্বকর্মে, স্বধর্মে ব্রতী হয়ে লোককল্যাণে কাজ করার উদ্যম, উৎসাহকেই নিষ্কাম কর্ম বলে।

এক দারুণ মুগ্ধতায় অর্জুনের ভেতরটা ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেতে লাগল। আর কেমন একটা পরিপূর্ণতার সুখে তার দুই চোখের পাতা ভারী হলো। আত্মমুগ্ধ ভাবুকের বিভোর দৃষ্টি তার চোখ দুটিকে অসামান্য সুন্দর করে তুলল। কৃষ্ণের ঢল ঢল দুই আঁখির ওপর তার ঘুম ঘুম চাউনি স্থির। তার ঠোঁট, ভুরু কাঁপছিল। নিজের মনে নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল : সখা তুমি কে জানি না। আমার মনের কথা, বুকের ভাষা হৃদয় দিয়ে ছোঁবার গভীরতা তোমার আছে। তোমার মুখে নিজের মনের ভাষা শুনব বলে তো উৎকর্ণ হয়ে থাকি। ওগো প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু—তোমার সব কথাই বুকের মধ্যে এমন করে গেঁথে যায় যে তখন আর তর্ক করতে পারি না। পারব না

বলতে ইচ্ছে হয় না। কেন করবে? অন্ধকার থেকে হাত ধরে আমায় আলোর ঝরনাতলায় পৌঁছে দাও। মন খুশি না হয়ে পারে?

সখা! কৃষ্ণের ডাকে সহসা চমকাল সে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে একটা গভীর শ্বাস পড়ল। দু'গাল বেয়ে তার অশ্রু গড়াচ্ছে দেখে নিজেও অবাক হলো। তাড়াতাড়ি উত্তরীয় দিয়ে মুছল। কৃষ্ণ তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বলল : তোমার হঠাৎ এ ভাবান্তর কেন? কী হয়েছে তোমার বলবে না? তোমার দেহমন জুড়ে কোন্ সুরের তরঙ্গ চোখের ধারা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে? কয়েকদিন ধরে যে কথাটা তোমার মনে ঝড় তুলেছিল, সে এখন আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্য থেকে কেউ কি চ্যুত হতে পারে? সত্য সবাইকে ধারণ করে রাখে। তোমার মনের সমস্ত তারগুলি এখন সে সুরে বাঁধা হয়েছে, তোমাকে দেখেই আমি টের পেয়েছি।

অর্জুনের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। কৃষ্ণের কথাগুলো তার সমস্ত সত্তার ভেতর প্রদীপশিখার মতো স্পন্দিত হচ্ছিল। কৃষ্ণের প্রসন্নতামাখা অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা ছাড়া সে চোখের তারায় আর কিছু দেখছিল না। তার মুখের উপর সূর্যের আলো পড়েছে। তাকে দেবতার মতো লাগছিল।



একটা অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল অর্জুনের মধ্যে। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে কোন অনন্তলোকে। মনে হচ্ছিল, রথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আকাশপথে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। সে নর্তিত ও ঘূর্ণিত হতে হতে ভেসে যাচ্ছে এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে। সেখানে কি আছে, কিছুই জানে না। তার যাত্রাপথে গ্রহ তারা, চন্দ্র, সূর্য, আকাশজোড়া বিদ্যুৎলেখার মতো ঘন ঘন চমকিত হতে লাগল। তার দুরন্ত গতিবেগে তারাগুলো ছিটকে যাচ্ছে। অণু-পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে মিশে যাচ্ছে শূন্যে।

ভয়ে অর্জুন চোখ বুজে আছে। বুকের মধ্যে এক তীব্র যন্ত্রণাময় অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। সে শব্দ বাস্তবে কোথাও ছিল না। তার হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুক্ শব্দের সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের শব্দময় তরঙ্গ মিশে গিয়েছিল। শ্বাসের মধ্যেও সে তার যাত্রার গতি টের পাচ্ছিল। একটা আচ্ছন্নভাবের ভেতর সজাগ হয়েই সে চোখ মেলল।

কোথাও আলোর রেশমাত্র নেই। অবোধ কঠিন গভীর এক অন্ধকার ছিন্ন করে রথ ছুটেছে সূর্যের উজ্জ্বল আলোকিত

প্রান্তরের দিকে। ঘোড়া দৌড়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে সামনের অন্ধকার রূপময় হয়ে যেতে লাগল। সাতরঙা সূর্যের আলো ময়ূরের মতো রামধনু রঙের পেখম ধরেছে যেন। সেই রঙের বর্ণচ্ছটা আরোপিত হয়ে যাচ্ছিল কৃষ্ণের তনুতে। এক অপরূপ দেববিগ্রহের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে দিল। অর্জুনের মনে হলো কৃষ্ণ তার মুগ্ধতার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছে। সে মুখে কিছুই বলছিল না। তবু অর্জুন হৃৎপিণ্ডের বিরামহীন স্পন্দনের মধ্যে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরই শুনছিল। কী আশ্চর্য সুন্দর সেই বাণী। একটু একটু করে সমস্ত চেতনা ডুবে যাচ্ছিল তার ভেতর আর সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

অর্জুন রণক্ষেত্রে তুমি প্রবেশ করলে যখন, তোমার দম্ভ, আমিত্বগর্বে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমি যেন দম্ভের প্রতিমূর্তি দুর্যোধনকে তোমার ভেতর দেখেছি। নিরলস সংগ্রাম ছাড়া সেই অজেয় দুর্যোধনকে তুমি সংহার করতে পারবে না। মনের সংঘাতে তুমি নিজেকে ছিন্নভিন্ন করছিলে। কারণ প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব সত্তা থাকে। সেই সত্তার সঙ্গে অন্য সত্তার প্রতিযোগিতা থাকে। সে কথা বোঝার ক্ষমতা হয়তো থাকে না সকলের, বাইরে থেকে তা বোঝাও যায় না। কিন্তু মনের ভেতর স্ব-স্বভাবের সঙ্গে বিরুদ্ধ ভাবের নিত্য লড়াই লেগে আছে। নীরব অদৃশ্য হারজিতের সে লড়াইতে মন হেরে গেলে যুদ্ধও থেমে যায়। আত্মা দুরাত্মা হয়। মন দুশমন হয়। কিন্তু শুভবুদ্ধির উপর আস্থা থাকলে একদিন মন স্ব-স্বভাবে ফেরে। মনের মন যতদিন নিজের কেন্দ্রে না ফিরছে ততদিন মনের লড়াইও শেষ হয় না। অর্জুন এই মনটাই সব। মানুষের মনের অভ্যন্তরটা হলো রণক্ষেত্র। আসল কুরুক্ষেত্র তো মানুষের মনের পৃথিবীতে। এই মনকে ক'জন চেনে? মনের

স্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপের মতো অবাঙ্‌মনসগোচর। একে চেনো না বলেই অহঙ্কার করে বল : আমিই সব। কিন্তু মনের মনই আসলে তোমাকে চালাচ্ছে। বুদ্ধির ভ্রমে অহং-এর দাস না হয়ে তুমি তাঁর হও।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দীপ্ত রোদের ঝিমধরা নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করে। কৃষ্ণের মধ্যে সে বিরাটকে দেখে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে অনুভব করে। তার মনে হয় কৃষ্ণ ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করতে আবির্ভূত হয়েছে। কৃষ্ণ অবতারী। কথাটা মনে হতেই তার গায়ে কাঁটা দিল। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে লাগল। তার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না।

কৃষ্ণের দু'চোখে সেই তদ্গত দৃষ্টি যা শুধু সাধকদের থাকে। কৃষ্ণের চোখে ঈশ্বরের সেই ধ্যানদৃষ্টি। তার বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতার নয়। কিছু একটা বলার ভূমিকা যেন। কৃষ্ণ তার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন বলছিল—অর্জুন তুমি আমার হও। আমি তোমার সুহৃৎ। তোমার রথের সারথি। তোমাকে তো আমি চালাব, নিয়ন্ত্রণ করব। তুমি আমার ওপর আস্থা রাখ। আমি তোমার। তোমার তুমিত্ব—তোমার মন, তোমার শরীর, তোমার আত্মা, তোমার শুভবুদ্ধিকে একসঙ্গে লাগামে বেঁধে আমি তোমাকে নিয়ে যাব অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে। তোমার সারথি জনগণ-মন-অধিনায়ক কৃষ্ণ। তোমার অগ্রজ ধর্মরাজ, মহাশক্তিরূপী ভীম, তোমার সহায় সত্যরূপী সাত্যকী, নির্ভীক তোমার প্রাণরূপী অভিমন্যু, তুমি নিজে মহাবলী গাণ্ডীবধারী। তোমার ভয় কিসে? কিসের শঙ্কা?

প্রশ্নের আকস্মিক চমকে চমকে গেল ভেতরটা। সারা শরীরের ভেতর তার স্পন্দন চলকে চলকে চলল। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো টান টান হয়ে উঠল। সপ্তস্বরা বীণার তারের ভিতরে

ভিতরে মৃদু স্পন্দন যেমন সুরের ভেলায় ভেসে যায় সুরলোকের দিকে তেমনি এক তীব্র অদ্ভুত গতিময় অনুভূতি অর্জুনের ভেতরটা প্লাবিত করে গেল। সেই প্রথম আলোর চরণধ্বনি কান পেতে শুনল অর্জুন। হৃদয় মধ্যে তার নূপুর বাজছিল। যেন মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। অন্তরের প্রসন্নতায় অর্জুন বদলে গেল। আচমকা একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল।

তার সমস্ত সত্তার ভেতর কৃষ্ণকে অনুভব করল। মহীরুহের মতো ছায়া মেলে তার জীবনকে ঘিরে রেখেছে যেন। তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই পরম প্রশান্তি আর একাত্মতার মধ্যে কৃষ্ণকে আলাদা করে তার দেখা হয়নি। নিজের জন্যে কিছু চায় না সে। স্বার্থহীন দানে পরিপূর্ণ তার হৃদয়। কত দরদ, মমতা থাকলে তবে অসীম ধৈর্য ধরে মনের সংশয়, অবিশ্বাস, ভ্রান্তিগুলো দূর করে এক পরমনির্ভরতায় ও বিশ্বাসে চিত্তকে আস্থাবান করে তোলে। সেই চৈতন্যরূপী মহামানবকে বন্ধুরূপে পাওয়ার সৌভাগ্যেগর্বে ও সুখে তার ভেতরটা টৈটুম্বর হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণের সান্নিধ্য যে এত মধুর আনন্দময় আগে কখনো জানা হয়নি অর্জুনের। এই প্রথম হৃদয়ের মধ্যে কান পেতে তার চরণধ্বনি শুনতে লাগল। এর আগে কৃষ্ণ কৃষ্ণই ছিল। এখন জন্মান্তরের মতো বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত হয়েই তার মনের আকাশ জুড়ে রইল। আর কি এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয়টা ভবে যেতে লাগল। এরকম একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা চেপে সুস্থ থাকা মুশকিল হলো অর্জুনের। তাই, ভেতরটা ভীষণ অধীর। নিজের চোখেই যেন তার নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। আর কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এইরকম ভাবান্তরের উৎসটা কোথায়—তার শরীরে. মনে, না কৃষ্ণ অনুরাগে? নিজের মনের আকুলতায় বিভোর হয়ে অর্জুন বলল : সখা, আমি তো তোমার কাছে নিজের চিত্তকে সমর্পণ করেছি। তবু আমার বুকে এ কিসের

অস্থিরতা? এতো ব্যাকুলতা কেন? এ কিসের মুগ্ধতা যে আমার সমস্ত শরীর-মন গান গেয়ে উঠছে।

অর্জুনের আকুলতায় কৃষ্ণ বেশ একটু আশ্চর্য হলো। এরকম কথা আগেও শুনেছে। তবু দুয়ের ভেতর কোথায় যেন ভীষণ অমিল। অর্জুনের মনের আঁধার যে অপসারিত হচ্ছে, ঊষার অরুণোদয়ের আয়োজন চলেছে সেখানে এবং শীঘ্রই ঘন কুহেলীজাল অপসারিত করে সূর্যোদয় হচ্ছে—এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। অনুরাগদীপিত দুই আঁখি মেলে কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে চেয়ে রইল। তাকে দেখছে, মৃদু মৃদু হাসছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলছে না। পিছনে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল উড়ছে। শুভ্র-মেঘের অল্প ছায়া পড়েছে তার মুখের ওপর। আর তাতেই মনে হচ্ছে মুখের চারপাশ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। তাকে তখন দেবতার মতো লাগছে।

নীরব প্রগাঢ় প্রশান্তি তার দুই চোখে। অর্জুনের মনের মধ্যেও এক অন্যভাব। সমস্ত চেতনার ভেতর কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল : —পার্থ, দুঃখ পাওয়ারও একটা দাম আছে। দুঃখ-যন্ত্রণায় মন আর্ত না হলে, অসহায় বোধ না করলে তো মানুষ ঈশ্বরের শরণাগত হয় না। তিনি বায়ুর মতো প্রচ্ছন্ন এবং নির্লিপ্ত বলেই জগৎময় তার অস্তিত্বকে তুমি টের পাও না। কিন্তু হঠাৎ তুমিও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ সেই ঈশ্বরের অংশ আমিও। কারণ, স্বর্গের ধরাচূড়া পরে ভগবান মর্ত্যে নেমে আসে না। মানবী মায়ের গর্ভে আর পাঁচটা শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আমার জীবনের সবকিছুই একটু অদ্ভুত। যে কোনো কারণেই হোক, মানুষের নজর কেড়ে নেওয়ার শক্তি ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। হয়তো আমিও তার সব কিছু ভালো করে বুঝি না। তবু আমাকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। কেন জানি না, লোকের অনন্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস নিয়ে আমার মনের

ভেতরে নিজের অজান্তে এক ঈশ্বরত্ববোধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। তখন সত্যিই মনে হয়, ঈশ্বরের মতো আমার অসীম ক্ষমতা। আমিই স্রষ্টা, পরিত্রাতা, রক্ষাকর্তা—আমিই সে। এই পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, শ্রেষ্ঠ আমারই সত্তার অংশ। এই অহংকার আমার অনুরাগী এবং ভক্তের তৈরি। যেমন, তুমি বললে, আমি চাইলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতো না। আমার ইচ্ছেটাকে সকলে এতবড় করে দেখে যে, পরমের আলো পড়ে মনটা বড় হয়ে যায়। নিজেকে তখন ঈশ্বরের পুত্র মনে হয়।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে কৃষ্ণ চুপ করে রইল। তার সুদূরপ্রসারী দুই চোখের তারায় কেমন একটা নিবিড়তা নামল। গাঢ় গভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলল : আমার জীবনে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত। অবিশ্বাস্য অলৌকিক। বোধ হয় ঐ সব ঘটনাই আমার মনে এক অলৌকিক শক্তিধর লীলাময় ভগবানের অনুভূতি এনে দেয়। নইলে, এক অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে কংসের সশস্ত্র বিশ্বস্ত প্রহরীদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কেমন করে ঝড় জলের রাতে বিক্ষুব্ধ যমুনা পার হয়ে গোকুলে এলাম? পুতনার মতো রাক্ষসীকে একজন শিশু হয়ে বধ করলাম কী করে? দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ বিরোধীদের উপদ্রুত অঞ্চল মথুরাকে সামান্য এক বালক হয়ে তো মুক্ত করলাম! স্বৈরাচারী রাজশক্তির নায়ক কংসকে একজন কিশোর বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে রাজক্ষমতা থেকে উৎখাত করল। কোন্ মন্ত্রবলে জরাসন্ধের মুহুর্মুহু আক্রমণ থেকে মথুরাকে নিরাপদ করলাম? দ্বারকায় নতুন রাজ্য স্থাপনই বা কেমন করে সম্ভব হলো? ভাবতে আমারও অবাক লাগে! এ কার শক্তি? মানুষের এত ক্ষমতা হয়? আমি কে? ভারতবর্ষের বহু নরপতি আমাকে ঈর্ষা করে, ভয় করে, শত্রুতাও করে—কিন্তু তারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মানও করে। মানুষের হৃদয়ের পূজা পেয়ে আমি সত্যিই ভগবান বনে গেছি। আমার এই ভগবানত্ব মানুষের

সৃষ্টি। অর্জুন, তুমিও অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে সেই সত্যকে অনুভব করো বলে আমার শরণাগত হয়েছ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নিজেকে আমার মহাকাল মনে হয়। কাল সবেগে শুধু আকর্ষণ করে। আমিও সকলকে মহারণে টেনে এনেছি। আমিই সে। সমস্ত ভূত, বর্তমান-ভবিষ্যৎ আমাতে অবস্থিত। অহংকারে অভিমানে তুমি আত্মবিস্মৃত হয়েছ। তোমার সেই আস্থা নেই বলে নিজের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছ। অবিশ্বাস, সংশয়, ভয় ত্যাগ করে তুমি আমার শরণ নিলে আর দোটানায় থাকবে না। মুখেই শুধু তুমি শরণাপন্ন বলছ। কিন্তু তোমার মন আমাকে সমর্পণ করতে পারনি। আমাকে দিয়ে-থুয়ে তুমি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেলে মনেতে তোমার আর কোন যন্ত্রণা থাকবে না।

হঠাৎই অর্জুন চমকাল। এতো কৃষ্ণের কথা নয়। সে তো কথা বলছে না। রথে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে টেপা হাসি। তা-হলে এ হয়তো তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা, কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর হয়ে তার মনের ভেতর ছড়িয়ে গেছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুক কাঁপিয়ে। কেমন একটা তদ্গতভাব নিবিড় হয়ে উঠল তার দুই চোখের তারায়। এক তীব্র ভালোলাগার মুগ্ধ আবেশে তার চোখের পাতা বুজে এল। নিরুচ্চারে মনে মনে বলল : সখা, এমন করে তোমাকে কোনোদিন অনুভব করিনি। নিজেকেও এমন করে তুমি মেলে ধরনি। জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে জানলাম—তুমি অনন্ত, অসীম, বিশ্বময়। তোমার ব্যাপ্তি ও বিরাটত্ব যে তোমার চৌহদ্দিতে ধরে না, কেমন করে বুঝব?

এক দারুণ শান্তি সুখের তৃপ্তিতে, অনুরাগে অর্জুনের দু'চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। কেমন একটা সাধকোচিত তন্ময়তায় ঘোর তার চাহনিতে। বলল : সখা, স্বর্গের ধরাচূড়া পরে ভগবান মর্ত্যে নেমে আসে না। ভগবানের গুণ ও কর্ম নিয়ে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে তারা

ঈশ্বরত্বকে পূজা করে। এই পূজা পেয়ে একজন শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, মহান মানুষ—মানুষের প্রাণের ঠাকুর হয়ে যায়। সখা, তুমিও আমার সেই প্রাণের ঠাকুর। আমার সমস্ত সত্তার ভেতর, ধ্যানের ভেতর আমি শুধু তোমাকেই দেখি। তোমার মুখ ছাড়া আর কারো মুখ আমার কল্পনায় আসে না। সত্যি করে বল, তুমি কে? তুমি কি সেই বিরাটপুরুষ? নররূপী ঈশ্বর?

কৃষ্ণ কি বলবে? বিস্ময়ে তার মুখ দীপ্ত হলো। বুকের ভেতর কেমন একটা উথলে ওঠা সাগরের মতো ভাব। মুগ্ধ গলায় বলল : অর্জুন বড় কঠিন প্রশ্ন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে তুমি বিপন্ন করে দাও আমাকে, যে উত্তর খুঁজে পাই না। আমি কে? এই আত্মজ্ঞান কি এত সহজ? কেন, আর কি এই প্রশ্নের কি শেষ আছে? ডাল-পালার মতো এক জিজ্ঞাসা থেকে অন্য এক জিজ্ঞাসায় বিস্তৃত হয়। মন, বুদ্ধি, জ্ঞান দিয়ে জানতে চাইলে, এই জানা কোনোদিন ফুরোয় না। প্রাজ্ঞরা বলেন জ্ঞান প্রেয়, বিজ্ঞান শ্রেয়। যা শ্রেয় তা হলো মাথার বিচার। আর প্রেয় হলো অন্তরের। প্রেয় থাকে লোকদৃষ্টির অতীত। আর যা আনন্দ, তা বিজ্ঞানের মোহ ছেড়ে এগুবে জ্ঞানের রথে। এ এক অদ্ভুত দর্শন। অথচ কত সহজে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে চিত্ত আপ্লুত করে মর্মের মধ্যে তুমি পরমকে অনুভব করলে। তোমার অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলা : সোহং — আমি সে। মানুষের বোধের সীমায় — অনুভূতির যতটুকু সাধ্য, মানুষের কাছে ততটুকুই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ। এই বিশ্বজগত প্রত্যেকের মনের ব্রহ্মাণ্ডে আছে। তার উপলব্ধির আলো পড়লে সমস্ত মন গান গেয়ে ওঠে—সমস্ত সত্তার মধ্যে আকাশজোড়া বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত হতে থাকে।

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—

জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হলো সে।
তুমি বলবে, এযে তত্ত্বকথা
কবির বাণী।
আমি বলব, এ সত্য।
... ...
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প!

এই বিশ্ব আমির চেতনা ক'জন মানুষের হয়? বেশির ভাগ আমিত্ব ; আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম ছাপিয়ে নিঃস্বার্থ কর্মের উপচার হয়ে বিশ্বপিতার পায়ে পুজোর ফুল হয়ে পৌঁছয় না।

কৃষ্ণের কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন ভাবছিল, যা কিছু আছে দৃশ্যে, গন্ধে গানে, সৌন্দর্যে তার মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তার মুক্তি আকাশে-বাতাসে, আলোয়-আলোয়, বনেপ্রান্তরে। এটা গভীর করে বোঝার। বোঝানোর নয়। সব কথা বোঝানোও যায় না। অন্তরে দীপ জ্বালিয়ে মনের আলোয় তাঁকে দেখতে হয়। তার জন্যে চিত্তকে তৈরি করতে হয়। যতক্ষণ মন বাসনামুক্ত না হয় ততক্ষণ ধ্যানে তাঁর স্বরূপ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে না। তা-হলে অন্তরের মধ্যে এ কোন কৃষ্ণকে দেখছে সে? চিরকালের দেখা কৃষ্ণের রূপটাই যে বদলে গেল চিত্তে। আকুল অন্তর কোন কৃষ্ণকে খুঁজছে? যে কৃষ্ণকে সে বুকের মধ্যে দেখছে তাকে কোন নামে ডাকবে, ভেবে পেল না অর্জুন। কৃষ্ণ তো তার মানসচক্ষের

সামনে নয়—জ্ঞানের মধ্যে, কামনার মধ্যে তার অনন্ত রূপের এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব দেখতে লাগল।

পাহাড়ে, নদীতে, অরণ্যে, আকাশে যে মধুর শান্ত সৌন্দর্যে হৃদয় ভরে ওঠে আনন্দে ও তৃপ্তিতে তার মধ্যে কৃষ্ণ যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার সব ভালোলাগার ভেতর, চোখকাড়া সব দৃশ্যের, কানভরা সব সুরের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যেই কৃষ্ণকে দেখছে। আর এক মহৎবোধে তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে যাচ্ছে। আকুল আর্তি নিয়ে নিজেকেই শুধাল ; যাঁর এ লীলা, সেই পরমশক্তির কাছে ব্রহ্মাণ্ড কেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মুহূর্তের খেলা। নইলে সাগর থেকে হিমালয় মাথা উঁচু করে ওঠে কোন শক্তির সামর্থ্যে? আবার সাগর থেকে মরু জাগে কার ইঙ্গিতে? কি করে জীব কোষে আসে জীব, জীবে আসে প্রাণের আলো, জাগে স্ফূরণ ও চেতনা? এর কোনো উত্তর নেই। এই বিশ্বসৃষ্টির আদি অখণ্ডস্বরূপ হয়ে পরমপুরুষ ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিরাজ করছেন। তাঁকে শুধু চিনতে হয়। নর্ম চোখ দিয়ে নয়, মর্মের ভেতর তাঁকে দেখতে হয়। সে দেখার চোখ তৈরি না হলে কেমন করে বিশ্বাস করবে যশোদা বৃন্দাবনের-ননীচোরার মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখেছে। গোপাল মুখ ব্যাদান করে মাকে দেখাচ্ছে সে ননী চুরি করে খায়নি। আর, যশোদা উন্মুক্ত মুখবিবরে দেখছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র দৃশ্যের স্থাবর-জঙ্গমের সব কিছু। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, পর্বত, নদী, সাগর-দিগন্তলীন অরণ্য, আকাশ, পৃথিবী, ভূমণ্ডলস্থ প্রাণী সব। একটা বালকের মুখ-বিবরে গোটা বিশ্বকে কখনো ধরে? প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন, পরমাত্মা যে মন্দিরে বা লোকে বিরাজিত, যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তা এই দেহভাণ্ড। সমস্ত জৈবিক প্রবাহ নিয়েই এই দেহটা হয়ে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই দেহেই তাঁর সৃষ্টি আবার এই দেহেই তাঁর লয়। এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছে

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। আছে পাহাড়, পর্বত, নদ ও নদী। সপ্তলোক এই দেহভ্যন্তরেই সন্নিবিষ্ট। তা-হলে তো যশোদার দেখা কখনো মিথ্যে নয়। বাৎসল্যের প্রভাবে জীবন ও বিশ্ব একাকার হয়ে যায়। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে জননী তখন আপন সন্তানের মাধুর্য ও লাবণ্যকে অনুভব করে। অসীম স্নেহমমতার সূত্রেই হয়তো বিধৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার অনুভূতি। পৃথিবীর কোন মা তাঁর সন্তানের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছে? জননীর আমিত্ব সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র আমি বিশ্ব আমির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

এক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলে অর্জুন চেয়ে আছে কৃষ্ণের দিকে। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। সেই আলো পড়ে মনটাই বড় হয়ে গেল। আব এক পুরনো অতীতকে কল্পনায় দেখতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দিনটি তার চোখে ভেসে উঠল।



প্রাকৃতিক দুর্যোগের সে এক ভয়ঙ্কর রাত। বাইরের ঝড়-জল, বজ্র-বিদ্যুতের এক দুঃসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে গাছপালা, পশুপাখির মতো অসহায় এবং বিপন্ন বন্দিনী দেবকী কংসের কারাগারে গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এক স্বরহীন কাতর কান্না আর কষ্টে তার দেহ বেঁকে যাচ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল।

বসুদেব অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। বুকে তার প্রার্থনা। ভগবান আর তো সহ্য হয় না। সহস্র বর্ষ আগে অসুরের অত্যাচারে, নিপীড়িতা জননী বসুন্ধরার কাতর আহ্বানে তোমার সুখের শয্যা টলে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এমন নীরব কেন?

দেবকী আর্তকণ্ঠে গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, হে দেব আর তো পারি না। হতশ্রী বসুন্ধরার মতো কবে আমাকে মুক্ত করতে আসবে তুমি? কবে? হে দেব, তুমি অন্ধকারের মধ্যে, দুর্যোগের মধ্যে আবির্ভূত হও। তুমি কি বধির হয়ে গেছ দেবতা? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না? সাত-সাতটি সন্তানের জননী হয়েছি, তবু বুকের স্নেহ উজাড় করে দেবার একটুও সময় পাইনি। পাষণ্ড কংস বাজপাখির মতো তাদের ছিনিয়ে নিয়েছে মায়ের বুক থেকে। আর কত যন্ত্রণা, অত্যাচার সহ্য করব? ও-গো অন্তর্যামী

তুমি কি মায়ের কান্না, বুকের আর্তি শুনতে পাও না?

শৃঙ্খলিত বসুদেবের দু'চোখের কোণ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। দেবকীকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : আর দেরি নেই। বিশ্বের আত্মা ভগবান এই ঝড়ের রাতে রুদ্রের বেশে আসছে। আর ভয় নেই। বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দে, মেঘের গর্জনে আমি তার নূপুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

গর্ভ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেবকীর কানে তার কথাগুলো পৌঁছল কি না কে জানে? একটা দুরন্ত কষ্টের সঙ্গে তখন সে একা লড়ছে। এক বুক হতাশা, পরিতাপ বুকের ভেতর যেন হাহাকার করে উঠল। আর তো পারছি না ভগবান। এবার আমাকে তুমি তুলে নাও।

সেই সময় একঝলক বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত কারাকক্ষ উদ্ভাসিত হলো। বসুদেবের মনে হলো আলোর রথে করে ভগবান যেন ঘরে ঢুকলেন। আলোর সে জ্যোতি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চিৎকার করে নবজাতক তার আগমন ঘোষণা করল। সেই মুহূর্তে বাইরে কোথাও প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল। মেঘের গর্জনে, বজ্রের শব্দে চাপা পড়ে গেল নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

বসুদেব চেয়ে আছে নবজাতকের দিকে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা।

মিট মিট করে ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। তার স্নিগ্ধ আলো পড়েছিল নবজাতকের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর। দেবকীর বুকেও এক অদ্ভুত মুক্তির স্রোত বয়ে গেল! মনে হলো সব দুঃখের অবসান। বুকের মধ্যে শুনল : জননী গো, আমি এসেছি।

দেবকী তার মুখের উপর মুখ রাখল। তার গায়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে ভেজা গলায় বলল : ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাতে এসেছ আমার দুঃখরাতের রাজা। কিন্তু তোমাকে পাষণ্ড কংসের হাত থেকে রক্ষা করি কেমন করে?

বহু দূর দিগন্ত থেকে বিদ্যুতের একঝলক আলোয় কারাকক্ষ

উদ্ভাসিত হলো। দেবকীর বুকের ভেতরটা থরথর কেঁপে উঠল। শিশুকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরল। শিশু ফিস ফিস করে তার কানে যেন বলল : মাগো, তোমার আঁধার রাতের রাজাকে হত্যা করার শক্তি কারো নেই। তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ। এই ভয়ের কারাগার আমাকে ধরে রাখতে পারবে না মা। দুর্যোগের রাতে এসেছি দুর্যোগকে ভয় পাওয়ার জন্য নয়। মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দিনে মানুষের পৃথিবীতে বার বার আমাকে আসতে হয়। এ আসা নতুন কোনো ঘটনা নয়। আকাশময় আঁকাবাঁকা পথের মতো সরু সরু রেখা টেনে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাল। ঐ আলোয় উদ্ভাসিত হল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি। দেবকীর দিকে হাত উত্তোলিত করে অভয় দিলেন ভগবান। চোখে তাঁর কৌতুক অধরে টেপা হাসি।

সহসা অর্জুনের বুকের ভেতরটা আলোড়িত হলো। তার সমস্ত অনুভূতির ভেতর শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী কৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপটি উদ্ভাসিত হলো। আলোর বিন্দুর মতো স্পন্দিত হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে।

হেমন্তের দীপ্ত মধ্যাহ্নের কবোষ্ণ রোদের গায়ে লেগেছে মুক্তির স্বাদ। কাঁকরে লাগানো লাল কুরুক্ষেত্রের মাটির বুক থেকে ধরণীর গন্ধ গায়ে মেখে উড়ছে ধুলো। নীল আকাশের স্নিগ্ধ রোদে ডানা মেলে শঙ্খচিলের দল আনমনে কিসের খোঁজে এ ওর পিছনে অবিরাম পাক খাচ্ছে। আর কুরুক্ষেত্রের দিগন্তনীল বিশাল প্রান্তরের পটভূমি ধর্ম-অধর্মের প্রতীকের মতো পাণ্ডব আর কৌরব সৈন্যবাহিনীর ছাউনি—দুই প্রান্তের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনের মনে হলো মহাকালের পাহারাদার হয়ে তারা যে যার সীমানা আগলাচ্ছে।

কিছু কিছু দৃশ্য থাকে যা মনে এবং চোখে এমন করে হঠাৎ গেঁথে যায়। গেঁথে থাকে অনেককাল। মনের মনটা তখন কি যে হয়ে যায়

মনই জানে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্রে ঝলমল কুরুক্ষেত্রের এই দৃশ্যটা অনেকটা সেরকমভাবে অর্জুনের মনের ভেতর গেঁথে গেল।

এই বিশাল পটভূমিতে কৃষ্ণকে হঠাৎই তার একজন ক্ষণজন্মা: অদ্ভুত আশ্চর্য মানুষ মনে হলো। ক্ষণজন্মা অবতারদের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে যেমন অদ্ভুত অদ্ভুত আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর গল্প আছে; কৃষ্ণের জীবনে বিবিধ ঘটনা ও কার্যকলাপ নিয়ে তেমনি কত গল্প। ও-গুলো গল্প না বলে ঘটনাই বলা উচিত। বিভিন্ন পরিবেশে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বিনা আয়াসে এমন মিলে যেতে, মিলিয়ে নিতে, তাকে স্ববশে আনতে, দমন করতে—কৃষ্ণর মতো একটি মানুষও তার চোখে পড়েনি।

কৃষ্ণ তার সমবয়সী। দু'জন দু'দেশে ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েছে। সেই সময়েই কৃষ্ণের গল্প লোকের মুখে দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। লৌকিক ঘটনা অলৌকিক হয়ে গেছে। তবু অজাতশত্রু ছিল না কৃষ্ণ। বরং শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে সে মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছিল। শিশুবেলা থেকেই তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বিস্ময়কর। নিজে পুতনার কপট অভিসন্ধি ব্যর্থ করে নিজেকে রক্ষা করল। শিশু বয়স থেকেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী : তার শকটভঙ্গ, অর্জুনবৃক্ষের মূলোৎপাটন লোকে দেখেছে। ধেনুকাসুর, অঘাসুর, বকাসুরের মতো দুষ্কৃতকারী, সমাজবিরোধী, অত্যাচারীদের সে শক্তহাতে দমন করেছিল ঐ বালকবয়সে। কুবলয়পীড়ের মতো খ্যাপা হাতিকে হত্যা করে নিজেকে রক্ষা করল। কালীয়নাগের মতো খল স্বভাবের হিংস্র প্রকৃতির মানুষকে এক আশ্চর্য কৌশলে জয় করল। কংসের মতো মানুষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করে মথুরাকে মুক্ত করল। কৃষ্ণের কোন্ কাজটা না আশ্চর্যের। সবই কেমন অদ্ভুত। আশ্চর্য গল্প। স্বপ্নের মতো। তবু এর কোনোটা অবাস্তব নয়। সবই তার জীবনে এক বাস্তব ঘটনা।



অর্জুন স্বপ্নালু চোখ মেলে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। একটা অদ্ভুত বিস্ময়মুগ্ধতা তার দু'চোখের চাহনিতে মাখামাখি হয়েছিল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে অশ্বরজ্জু ধরে কৃষ্ণ এক ভাবে রথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী গভীর এক সম্মোহনশক্তিতে ঢুলুঢুলু তার দুটি চোখ। অনুরাগদীপিত দুই চোখ মেলে অর্জুন চুপ করে চেয়ে রইল। অর্জুনের চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল কৃষ্ণ যেন একটুও চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয় তার শক্তি। অর্জুনের চোখ ফেরানো শক্ত হলো। তার ভেতরটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যেতে লাগল।

পার্থসখা কৃষ্ণই কি তা-হলে 'সে'? ঈশ্বরের নররূপ? নারায়ণ! এরকম একটা আচমকা প্রশ্ন মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির ভেতর, চেতনার ভেতর কিসের যেন তরঙ্গ বয়ে গেল তার। অথচ কৃষ্ণ কিছুই বলছিল না, তবু মনে হলো তার সমস্ত সত্তার ভেতর কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর মন্দ্রিত হচ্ছে। সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—সখা, মানুষের অবিচারে, অত্যাচারে, ঘৃণায়, হিংসায়, অন্যায়ে-অধর্মে পৃথিবীটা যখন নোংরা হয়ে যায়, মনের মধ্যে যখন ঝড় ওঠে ; পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্পর্কে

মানুষ বড় বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়, নিজেকে ভীষণ বিপন্ন, অসহায় ভাবে। সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায় এবং যখন দুঃখী, দুর্গত, মার খাওয়া সরল, ধর্মভীরু, সৎ বিবেকবান, মুখ থুবড়ে পড়া মানুষেরা সাহসের অভাবে এগোতে পারে না, কর্তব্য স্থির করতে পারে না, কোন্ পথে চলবে ভেবে দিশেহারা হয়—অথচ ভেতরে ভেতরে একটা বিরাট পরিবর্তনের জন্যে চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে ; তখন তাদের টেনে তোলবার জন্যে বুকে বল ও সাহস দিয়ে আত্মশক্তি জাগ্রত করে সঙ্গী হিসেবে তাদের সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীটাকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার মহান সঙ্কল্পে এবং জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু পথনির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যেই আমি বার বার এই পৃথিবীতে আসি। তুমি, আমি এই পৃথিবীতে বহুবার জন্মেছি,—তোমার সেকথা মনে নেই, কিন্তু আমি ভুলিনি। অভ্যেস, সংস্কারের ভারে চাপা পড়ে যাওয়া মনের আবরণ সরিয়ে তুমি নিজেকে দেখার কোনো চেষ্টা করছ না। তোমার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো তফাত নেই। বলতে কি, তুমি তো তাদেরই একজন। তাদের মতো তোমার অন্তরেও বিরাট শূন্যতা হতাশা অক্ষমতা রয়েছে। তোমার মতোই বেপথু, বিশ্বাস হারানো নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ, সাহসের অভাবে থেমে পড়া মানুষকে যেকোনোভাবে ঘুরিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্যে, তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আমাকেও আসতে হয়। দেবতার আশীর্বাদধন্য হয়ে আমার মতো মানুষেরা আসে। ঘন ঘন আসে না। বহু যুগ পরে আসে ঈশ্বরের শক্তিপূত হয়ে। তোমার মতো সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের স্বপ্নের পৃথিবীকে সুন্দর করতে সাহস আর সততাকে মূলধন করে তারা এগিয়ে যায়।

কৃষ্ণ মুখে কিছুই বলছিল না। চুপ করে অর্জুনের দিকে

চেয়েছিল। হৃৎস্পন্দনের শব্দের মধ্যে কেমন এক অদৃশ্যালোক থেকে ভেসে আসা আকাশবাণীর মতো অর্জুন কৃষ্ণের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। তার সমস্ত চেতনার ভেতর গ্রীষ্মের ঝাঁঝালো রোদের মতো থির থির করে কাঁপছিল। মুখে একটা বিহ্বলভাব। শান্তনীল আকাশে. সূর্যের মিষ্টি আলোয় কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে তার শুধু দীন মনে হচ্ছিল না, অনেক অদ্ভুত কথাই মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আর একটা মহৎবোধে তার ভেতরটা ভরে যাচ্ছিল। কৃষ্ণ তার সত্তার ভেতর সেই বিরাট পুরুষের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমস্ত চেতনা শূন্যে, মহাশূন্যে অভিসার করছে। বিশ্বনিখিলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত সেই বিরাট পুরুষের রূপ দিব্য নেত্রে দেখছিল। সে কৃষ্ণকে দেখছিল না। কৃষ্ণের মধ্যে এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখছিল। কোথায় তার আরম্ভ, কোথায় শেষ কিছুই দেখছিল না। কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদের দেখল। সেই বিরাটের প্রদীপ্ত অনেক বর্ণ বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল নয়নে রুদ্র ও শিবরূপে সূর্য ও চন্দ্র বিরাজ করছিল। অর্জুন সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করে বলল, হে বিশ্বেশ্বর, তোমার এই বিরাট রূপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি আত্মস্থ হও। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণু হয়ে যাও।

কৃষ্ণের হাতের স্পর্শে অর্জুন চমকে উঠল। স্বপ্নের ঘুম থেকে জেগে উঠল। কিন্তু তখনও ঘোর কাটেনি। ভেতরটা তখনও এক অদ্ভুত আবেগে কম্পমান। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর অর্জুন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর কণ্ঠস্বর শুনল : আমি লোকসংহারে প্রবৃত্ত মহাকাল। আমি দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালক। নিজের ইচ্ছায় কেউ কিছু করে না। আমিই করি। আমিই কর্তা। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলের বীরেরা কেউ জীবিত থাকবে না। তুমি যুদ্ধ কর। ভয় পেয়ো না। যুদ্ধ জয়ে

সন্দিহান হয়ো না। আমি প্রজ্ঞারূপী মন তোমার। এ যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দেবে। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও তুমি।

অর্জুনের প্রকৃতিস্থ হতে একটু সময় লাগল। দিশাহারা অবিশ্বাসের চোখে কৃষ্ণের শ্রীময় মুখখানার দিকে চেয়ে থাকল। তার সন্দেহ হলো, সে কি ভুল দেখছে? রথে ঘুমিয়ে পড়েছিল কি? কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কি স্বপ্নেই দর্শন করল? কেমন একটা খুশির তরঙ্গ বয়ে গেল তার ভেতরে। ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মুখচোখের ভাব বদলে গেল। যোগস্থ ভক্ত যেমন ধীরে ধীরে চোখ মেলে অনন্ত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ভগবানের দিকে, অর্জুনও তেমনভাবে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে স্বপ্নের বিষ্ণুকে দেখছিল।

কৃষ্ণ তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল : সখা, কার সঙ্গে কথা বলছিলে? প্রিয়সখি পাঞ্চালীর সঙ্গে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুঝি এভাবে কথা হয়?

অর্জুন কথা বলল না। কৃষ্ণের চোখের ওপর চোখ পেতে রাখল। কৃষ্ণকে এত বড় করে এত গভীর করে ভাববার সময় পায়নি। রণক্ষেত্রে তার সব অহংকারকে কৃষ্ণ দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের ঘরে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধার দীপ জ্বেলে দিয়েছে। এখন আর অখ্যাতির ভয় নেই, লোকনিন্দার ভয় নেই, কিংবা স্বজনহত্যার ভয়ে ভেতরটা কাতর হচ্ছে না। ভয়ের শিখা অন্তঃস্তল থেকে উঠে চারদিক দগ্ধ করতে করতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেহ-মন জুড়ে জ্যোতির্ময় শিখার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে—আর তার অহং বীরত্বের দর্প, সাধুতার গর্ব, সম্মান রক্ষার সতর্কতা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দহনে তার কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই বরং নিজের সব কিছু নিবেদন করে নিঃস্ব-রিক্ত হওয়ার ভেতরেও যে সুখ আছে, আনন্দ আছে

সেই অপার্থিব আনন্দে অর্জুনের চিত্ত পরিপূর্ণ হলো।

কৃষ্ণের কৌতুক নিমেষে তার সমস্ত অভিব্যক্তিকে বদলে দিল। কেমন একটা খুশি আর গৌরববোধে তার মনটা দীন হয়ে গেল। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল। অধরে স্ফুরিত হলো হাসি। বলল : সখা. স্বপ্নে মহাকালের এক আশ্চর্যরূপের মধ্যে তোমাকে দেখলাম। আমার সমস্ত চেতনার ভেতরে পরম পুরুষের রূপ ধরে তুমি জ্যোতির্ময় হয়ে গেছ। আকাশজোড়া বিদ্যুৎলেখার মতো চমকিত হতে লাগল আমার ভেতরটা। তুমি আর সে তুমি নেই। কী ভয়ঙ্কর তোমার সে রূপ। তার আদিও নেই, মধ্যও নেই, অন্তও নেই। ভয়ে আমার ভেতরটা কাঁপছিল। আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি জানি না, এই অনুভূতির উৎস কোথায়? আমার মনে, না তোমার সম্মোহনে? সমস্ত কিছুর সঙ্গে আমার মাথাও ঘুরছে। ভিতরে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করলাম। সেই মুহূর্তে আমায় ডাকলে তুমি। স্বপ্ন থেকে চোখ মেললাম। দেখলাম, সে তুমি আর নেই। সখা হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছ। আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব এক হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। আমার আর কোনো কর্তৃত্বাভিমান নেই। আমি শুধু তোমাব। এই রণক্ষেত্রে আমি আর কাউকে নয়, তোমাকেই দেখছি শুধু।

রথের অশ্বগুলি এক জায়গায় অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল। বারবার মাটিতে পা ঘষছিল। কৃষ্ণ দৃঢ় হস্তে অশ্বরজ্জু টেনে ধরতে তার হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল। অশ্বগুলোর ভিতরকার সব অস্বস্তি, অস্থিরতা নিমেষে থেমে গেল। তারা শান্তভাবে দাঁড়াল।

অর্জুনের কথার প্রত্যুত্তরে বলার মতো কথা খুঁজে পেল না কৃষ্ণ। অপলক চোখে চেয়ে দেখছিল তাকে। ওর চোখের চাহনিতে কেমন একটা তন্ময়তার ভাব। সে একেবারে অন্য

মানুষ হয়ে গেছে। ভয়ের কারাগার ভেঙে বেরিয়ে এল অর্জুন. আত্মীয়স্বজনের বন্ধনও মন থেকে ঝরে গেছে। সে এখন একা। অর্জুনের সঙ্গে তার বহুকালের সম্পর্কটাও বদলে গেছে মনে হলো। অর্জুন তাকে দেখছে, কি ভাবছে—অর্জুনই জানে। কৃষ্ণের নিজের মনেও বিস্ময়। মাঝে মাঝে তার নিজেরও মনে হয়—সে যদি দেবতা হয়, তাহলে দেবতার শক্তি কোথায়? তার ইচ্ছেয় তো সব কিছু হয় না। দেবতার ক্ষমতাই বা কই? এক অব্যক্ত তীব্র ক্রোধের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর তীব্র ভালোলাগা। যে ভালোলাগা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ প্রথম অনুভব করল। অধরে তার স্মিত হাসি। আস্তে আস্তে বলল : সখা, স্বপ্নজগতের কোন কল্পনার ধোঁয়াটে স্বর্গে বাস কর তুমি? আমি বাস্তব জগতের রক্তমাংসের কৃষ্ণ। দেবতার শক্তি আমার নেই। আমি দেবতাও নই। মানুষের মনের আবরণ সরিয়ে তার ভেতরটা দেখানোই আমার কাজ। আমি তোমার বিভ্রান্ত মনকে স্ব-স্বভাবে ফেরাতে চেয়েছি। শুনে ভালো লাগল, তোমার মনের কোনো সমস্যা নেই। আত্মীয়-স্বজনের বন্ধনও মন থেকে ঝরে গেছে। ভয়ের কারাগারও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রণক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজের আলাদা সত্তা এবং স্বকীয়তা দেরিতে হলেও অনুভব করতে পারে। প্রত্যেক মানুষের এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তার দ্বন্দ্ব বিরোধ থাকে। সে কথা বোঝার ক্ষমতা থাকে না সকলের। বাইরে থেকে তা বোঝাও যায় না। তবু নিজের সঙ্গে নিজের অনুষঙ্গর সঙ্গে ছায়ার লড়াই লড়ে লড়ে ক্লান্ত হয়। তোমার ভেতর নীরব অদৃশ্য সে লড়াই দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। মনের মধ্যে যে যুদ্ধ তোমার শুরু হয়েছে তার গন্ধমাদন উৎপাটন করতে না পারলে পুনরুজ্জীবনের বিশল্যকরণী পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধের আগেই তোমার তুমিকে চেনালাম। মানুষের নিজের মধ্যেই হারজিতের লড়াই

লেগে আছে প্রতিমুহূর্ত। যে জিতে যায় লোকে বলে জিতল সেই। যে পারল না, হার হলো তার।

কৃষ্ণেব কথাটা অর্জুনের বুকে ছুঁয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল রথেব উপর দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণের দিকে। রাহু কবলিত সূর্যের একপাশ থেকে আসা মৃদু আলো কৃষ্ণের মুকুট থেকে বেরিয়ে-পড়া কানের দুপাশে চুলের গায়ে রুপোলি রেখার আভাস লেগেছে। তাতে কৃষ্ণকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। অর্জুনের মুগ্ধ দৃষ্টি কৃষ্ণের শরীর ভেদ করে মৃদু নরম সূর্যের আলোকিত প্রান্তরে প্রতিসরিত হয়ে দিগন্তের গাছপালার আকাশের সঙ্গে মিলল। মুখোমুখি দু'জন দাঁড়িয়ে রথে। কারো মুখে কথা নেই।

নীল আকাশ থেকে সূর্যের নরম আলো আশীর্বাদের মতো অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে লাগল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর জুড়ে। অর্জুনের মনেও তার একটা খুশির ভাব বয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বলল : সখা, নিজের সঙ্গে মানুষের এই লুকোচুরি খেলা কেন? নিজেকে হয়রানি করার তার মজা কি? একজন মানুষ সততার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের ভেতর নিজেকে যখন আবিষ্কার করতে পারে। নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়, তখন নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলে কেন?

কৃষ্ণের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস ফুটে উঠল। বলল : হৃদয়ের অনক প্রশ্নের, বিস্ময়ের কোনো উত্তর নেই মস্তিষ্কের কাছে। অতৃপ্তি, দুঃখবোধের তো কোনো শেষ নেই। প্রশ্ন করে সব জানাও যায় না। যেটুকু পাও সেটুকু নিয়ে খুশি থাক। যা দিতে পার সেটুকু নাও। যা পার না তাই চেয়ে মনের সুখকে অসুখ করে তুলনা কোনদিন। তাতে ঐ পাওয়ার আনন্দও মরে যাবে।

তাবপর কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল। গাঢ় গভীর গলায় বলল : সখা, তুমি বোধ হয় আসল উত্তরটা এড়িয়ে গেলে। ঈশ্বর

যাইই করেন তারই পেছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। সেই যুক্তি আমাদের ঘোলা ও অদূরদৃষ্টি চোখে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি না। আমারও বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে শাস্তি পাওয়া হয়তো দরকার ছিল। সমস্তরকম অনুভূতির ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো গভীর উদ্দেশ্য হয়তো আছেই। তাঁকে বা তাঁর স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা নেই বলে হয়তো মনে হয় ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

প্রশান্ত মধুর হাস্যে কৃষ্ণের শ্যামবদন উদ্ভাসিত হলো। মধুর কণ্ঠে বলল : আমি তোমার সখা। বড় বড় কথার পাথর চাপিয়ে তোমার আর্ত মনকে আকুল করে দিতে চাই না। তোমার মনের ওপর অনেক উপদ্রব করেছি। নিষ্ঠুরও হয়েছি। কিন্তু তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করেছি এরকম যেন ধারণা তোমার না হয়। আমার চোখে তুমি শুধু বিশ্বজয়ী অর্জুন। একজন নির্ভীক যোদ্ধা। যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হোক, সেও ভালো—কিন্তু মনের দুর্বলতায় তুমি ভেঙে পড়, পরাজিত হও প্রতিকূল অবস্থার হাতে, তা-হলে আমি তা সহ্য করতে পারব না। সে হবে আমার স্বপ্নের মৃত্যু। আমার বড় পরাজয়। নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে, বিশ্বাসে অটুট থাকতে, নিজের গর্ব নিয়ে সুখে আনন্দে ঘর করতে মরিয়া হয়ে যুদ্ধার্থে তোমাকে প্রস্তুত করেছি। কারণ, আমি জানি, একজন মানুষকে ভেঙে ফেলা যায়, নষ্ট করে দেওয়া যায়। কিন্তু নিজে সে হেরে না গেলে তাকে হারানো যায় না। মানুষের মতো মানুষকে হারানো সহজ নয়। সাময়িক দুর্বল ভাবাবেগ তুমিও কাটিয়ে উঠবে। তুমি আমার বিশ্বাসকে এবং আশাকে জয়যুক্ত করে আমাকেই ঋণী করেছ।

কথা শেষ করে কৃষ্ণ অশ্বরজ্জুতে টান দিল। অমনি রথ নড়ে উঠল। অশ্বগুলো যেন মুক্তির উল্লাসে লম্বা লম্বা পা ফেলে

দৌড়তে লাগল।

অর্জুনের মুখে চোখে হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁচের মতো বিঁধতে লাগল। কী অপূর্ব স্বাদ তার। বাতাসের স্পর্শ-সুখের আরামে তার দুই চোখের পাতা বুজে গেল। গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে সে যেন সারা শরীরে তার স্নিগ্ধতাকে মেখে নিচ্ছিল।

রথে যেতে যেতে অর্জুনের বারংবার মনে হচ্ছিল, তার ব্যক্তিত্বটাই যেন বদলে গেছে। শরীর, মন বেশ ঝরঝরে তাজা লাগছিল। কৃষ্ণের দিকে বিস্ময়ে অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে তার কণ্ঠে গান এল। নিজের মনেই গুনগুন করে গাইল : "পাহারা রেখেছ, আমি পাছে পা হারাই বলে। পাহারা রেখেছ।"

অশ্বক্ষুরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। নিঃশব্দ বনস্থলীতে দু'ধারে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে পাহারাদারের মতো হাঁক দিয়ে নির্জনতার ঘুম ভাঙাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে পাখিরা কলরব করছে। সূর্যকে মাথায় করে রথ ছুটছে। গাছের চন্দ্রাতপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো গলে পথের ওপর আলপনার আঁকিবুকি কেটেছে। অর্জুনের মনটা এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল। মনের মধ্যে তার বিস্ময়ের অন্ত নেই। বিভোর হয়ে গিয়ে সে গাইল : 'বড় বিস্ময় মানি' হেরি তোমারে—'

গান শেষ করে অর্জুন জিগ্যেস করল : সখা, আমার মনে এখন কোন অবস্থা চলেছে এই অবস্থাকে কি বলে? এই অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এই চিরঅতৃপ্তির নাম কি? এর উৎস কোথায়? এই অনুভূতি আমাকে স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছে না কেন? এ আমার হলো কি?

কৃষ্ণের দৃষ্টি পথের ওপর স্থির। অর্জুনের প্রশ্ন শুনে থামল। পিছনে বসে অর্জুন সে হাসি দেখতে পেল না। সুধাঝরানো গলায়

বলল : এ হলো অপূর্ণতা থেকে পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়া। পরিপূর্ণ হয়ে গেলে আর কোনো অস্থিরতা থাকে না। কলসী জলপূর্ণ না হওয়া পর্যন্তই তার শব্দ। ভরন্ত কলসের কোনো শব্দ নেই। ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তেমনি সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ হয়ে যায়। মনের ঘরে ঘরে আনন্দের দীপ জ্বলে উঠে। পরমের কাছে নানাভাবে নিজেকে নিবেদন করাই তখন একমাত্র সুখ। তোমার মনে তারই সুর লেগেছে।

অর্জুন কেমন উদাসভাবে বলল : কী জানি? তবে নতুন পথের নিশানা তো পেয়েছি। আমার নিজের সঙ্গেই কতরকমের বিরোধ ছিল। সে দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধারের পথ ছিল, কিন্তু সে পথটা আমি চিনে নিতে পারিনি। তুমি আমাকে চিনিয়ে দিলে। তুমি আমার বিবেক, জ্ঞান, আমার ইষ্ট। আমার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব। আমার ইহকাল, পরকাল। আমি তোমার ছায়া। নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না। যেভাবে তুমি চালাও সেভাবেই চলি। তোমার হাতের মোহন বাঁশি আমি। তোমার সুরে সুরময় হয়ে উঠি। অহং-এর ঘোরে নিজেকে কর্তা বলে ভুল করেছিলাম। তুমি আমার সেই ভুল ভেঙেছ। আমার সমস্ত মনটাকে বদলে দিয়েছ আমার নবজন্ম হয়েছে।

কৃষ্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুনকে দেখল। এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বলল : আমি নিমিত্ত। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয় তেমনি একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করছ তুমি। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ। বীরের মৃত্যুশয্যা রণক্ষেত্র। সেখান থেকে তুমি পালাবে কোথায়? মূল স্রোতে তোমাকে ফিরতেই হবে। প্রত্যেক মানুষের মুক্তি তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই খবরটা কেবল ভেতরে পৌঁছে দিতে হয়। নিজেকে আবিষ্কার করা যে কী অসীম আনন্দের ব্যাপার কী দারুণ মুক্তির ব্যাপার—সে কেবল সফল ব্যক্তিই জানে।

গভীর এক ভালোবাসার সুখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অর্জুন। রথে যেতে যেতে বিপুল আবেগের শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে তার ভেতরটা অস্থির হলো—এ জিনিসটা কি? নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে হলো তার মনের অন্ধকারে যে রাতজাগা পাখি ডানা ঝাপ্টাচ্ছিল ; কাতরাচ্ছিল—দিনের আলো তার ভেতরের সব যন্ত্রণাকে মুছে দিয়ে এক গভীর প্রশান্তিতে নিশ্চল করে দেয়। অর্জুনেরও মনে হলো তার ভেতরে আর কোনো যন্ত্রণা নেই। কেমন যেন হয়ে গেল তার ভেতরটা। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল : সখা, এ আমার হলো কি? তোমার সঙ্গে পাশাপাশি, একসাথে আছি কতকাল। কিন্তু এই মন নিয়ে আগে তোমাকে দেখিনি। এ আমার নতুন দেখা। এই দেখা কোনোদিন ফুরোবে না। চারপাশে চেনা মানুষের মধ্যে সত্যিকারের শুভার্থী খুব কম মানুষের ভাগ্যে হয়। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। জীবনে বাঁচার মানে তুমি যেমন আবিষ্কার করেছ সাহসের সঙ্গে, আমাকেও তেমনি এক কঠিন সংকট থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। শারীরিক সাহস নয়, মনের সাহসটাই যে সাহস—এই সাহসেই একটা মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচে ; এতবড় সত্যটা সারা জীবনে আমার জানা হয়নি। আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে পথের এ হদিস বোধ হয় তোমাকে দিতে পারতাম না।

অর্জুনের দু'চোখের গভীরে কৃষ্ণ নিজের দু'চোখ ডুবিয়ে দিয়ে চেয়ে রইল।



পরের দিন সকালবেলা।

সারা আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠল। গাছের ডালে ডালে কমলা রঙের রোদ লেগেছে। শিশিরভেজা পাতায় রোদ ঝলমল করছে। পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ তখনও কাস্তের মতো ঝুলে আছে। পশুশালা থেকে অশ্বের ডাক. হাতির ডাক, মানুষের হাঁকাহাঁকি, চিৎকার, চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

অর্জুন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হয়ে কৃষ্ণের অপেক্ষা করছিল। কপিধ্বজ রথ নিয়ে কৃষ্ণ শিবিরের সামনে দাঁড়াতেই অর্জুন বেরিয়ে এল। চেহারার কী অসাধারণ দীপ্তি। চলনে কী দৃপ্ত ভঙ্গি। সূর্যের আলো পড়ে রণসাজ ঝলক দিচ্ছিল।

বিস্ময়ে পুলকে কৃষ্ণের বুকের ভেতর গান গেয়ে উঠল।

অর্জুন দৌড়ে এসে রথে উঠল। হাতে গাণ্ডীব, পৃষ্ঠে তূণ।

পিতামহ শঙ্খনাদ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পাঞ্চজন্য বাজিয়ে কৃষ্ণ হর্ষ প্রকাশ করল। অর্জুনের ধমনীর মধ্যে শিহরন জাগল। সুগঠিত মাংসপেশীতে লাগল যুদ্ধোন্মাদনার অস্থিরতা। গাণ্ডীবে ঘন ঘন টঙ্কারধ্বনি করে অর্জুন তা জানান দিতে লাগল।

শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে কৃষ্ণের বুকের ভেতর যেন ঢেউ দিয়ে গেল। কৌতুক ঝলকে উঠল দু'চোখের তারায়। বড় বড় চোখ করে কৃষ্ণ তাকিয়ে আছে অর্জুনের দিকে। অধরে মৃদু হাসির আভাস। বলল : সখা তোমাকে বড় ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে তুমিও অনুভব করবে, নিরানন্দে কোনো বড় কাজ হয় না। যন্ত্রণা ছাড়া আনন্দের কানাকড়ি দাম নেই। আনন্দ যে কত বড় জিনিস, কি বিশাল ব্যাপ্তি তার, কী মুক্তি তার ভিতরে বহু কষ্টের মূল্যে তাকে জানা যায় বলে আনন্দের এত দাম! সন্তান জন্ম দেবার সময় মা'র যে প্রসব যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পেতে হয় তার মধ্যে আনন্দ থাকে। মনে যদি আনন্দিত না থাকে, আমার প্রিয় সখির অপমান আনন্দে ভরে দেবে কেমন করে?

অর্জুন লজ্জা পাওয়া গলায় বলল : আমার মধ্যে তো আর কোনো আড়াল নেই। লুকোলুকি নেই কিছুই। মনেতে কোন পাপবোধ, অপরাধবোধও নেই আর। অভ্যাস, সংস্কারের হাত থেকে একজন মানুষে মুক্ত হতে তো কিছু সময় লাগে। সেই সময়ের ভেতর সে যদি নিজেকে মুক্ত করতে না পারে, তবে তার জীবনের মুক্তির সব চেষ্টা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তুমি তার এক নতুনতর ব্যঞ্জনা বয়ে আনলে আমার জীবনে। বিপজ্জনক এক মৃত্যু থেকে মরতে মরতে বাঁচিয়ে দিলে। তোমার কাছে আমার এ ঋণ কোনোকালে শোধ হওয়ার নয়।

কৃষ্ণ চুপ করেছিল।

লাল মাটির পথ বেয়ে হিরন্বতী নদীর তীর ধরে কপিধ্বজ রথের সঙ্গে বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীও অর্জুনের পিছু পিছু চলল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের দিকে—মৃত্যু-মাতাল রণক্ষেত্রে, বিরাট এক মৃত্যুর হোতা হয়ে।

নমামি কৃষ্ণ সুন্দর
